প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য তথা মঙ্গলকাব্যের পশ্চাদ্‌পট বিশ্লেষণ

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য তথা মঙ্গলকাব্যের পশ্চাদ্‌পট বিশ্লেষণ

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ কোন সাহিত্যের মূল্যায়ণ ঐতিহাসিক পটভূমির অপেক্ষা রাখে। তাই একটি সাহিত্যকে জানতে হলে তার ঐতিহাসিক পটভূমিকেও জানা প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য যে মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমিতে রয়েছে এক রক্তাক্ত ইতিহাস। অতি প্রাচীনকাল থেকেই বারবার বিদেশী ও বিধর্মী জাতি ভারতবর্ষের বুকে আঘাত হেনেছে, কিন্তু তুর্কী আক্রমণের আগে পর্যন্ত কোন শক্তিই বাঙালী সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করতে পারেনি। পর্যায়ক্রমে বহু রাজশক্তির উত্থানপতন ঘটলেও বাঙালীর সমাজিক জীবনে তার ছায়াপাত ঘটেনি। তুর্কী আক্রমণই বস্তুতপক্ষে প্রথমবার বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আঘাত হানতে সমর্থ হয়েছিল। তুর্কী আক্রমণ ছিল বাঙালীর পক্ষে একটি সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা, এই আক্রমণকে প্রতিহত করার কোন মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। ১২০২-১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খিলজি (কথিত আছে) মাত্র সতেরো (১৭) জন অশ্বারোহী সেনা নিয়ে নবদ্বীপ জয় করেন। এরপর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যপর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস হল মুসলমান শাসনের ইতিহাস, এই পর্বের ইতিহাস হল তুর্কী, পাঠান, মোগলের উত্থান-পতন-দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইতিহাস।

বখ্‌তিয়ার খিলজির মৃত্যুর (১২০৬)পর প্রায় কুড়ি বছর খিলজি বংশীয় আমীর-ওমরাহগণের শাসনকাল। বহু হত্যা এবং রক্তপাতের পর শেষ সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইয়াজ খিলজি কিছুটা হলেও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি দিল্লীশ্বরের বিরোধিতা করায় সিংহাসন ও প্রাণ দুই-ই হারান, অবশেষে ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে শাম্‌সউদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার শাসনভার গ্রহণ করলে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। তুর্কী আক্রমণের সময় থেকে ইলিয়াসশাহী বংশের শাসনের সূত্রপাত পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসে এক বিশেষ কালপর্ব । ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম পর্বের পর ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী পর্যায়ে একবার হিন্দুর পুনরুত্থান ঘটেছিল। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার ভাতুরিয়া পরগণার সুবিখ্যাত জমিদার রাজা গণেশের নেতৃত্বে হিন্দু শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল। রাজা গণেশ 'চণ্ডীচরণপরায়ণস্য দনুজমর্দনদেব' উপাধি ধারণ করে ক্ষমতা বিস্তার করেন।[১] তুর্কী বিজয়ের সময় থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলায় হিন্দু নরপতি বলতে শুধুই রাজা গণেশ, কিন্তু ইসলাম ধর্মাবলম্বী আমীর-ওম্‌রাহ এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে অল্পকালের মধ্যে তার পতন ঘটে এবং গণেশের পুত্র যদু বা জিৎমল ইসলামধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দিন নাম ধারণ করে কিছুকাল শাসন করেন। ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা গণেশের বংশের শেষ শাসক শামসউদ্দিন আহম্মদ শাহের মৃত্যু হলে ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। নাসিরউদ্দিন মাম্‌দ শাহের অধীনে ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় পর্যায় মামুদশাহী বংশ নামে পরিচিত। নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহের পুত্র রুকনুদ্দিন বারবক শাহ সুশাসক ছিলেন ফলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিও তারা অনুরাগী ছিলেন। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মামুদশাহী বংশের অবসান হলে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছয় বছর হাবসী হোজার শাসনকাল চলে। হাবসীরা ছয় বছর ধরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল, বাংলার ইতিহাসে হাবসী শাসনকাল এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত। হাবসী শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলার হিন্দু-মুসলমানরা সম্মিলিত ভাবে শেষ হাবসী সুলতান শামস্‌উদ্দিন মজফ্‌ফর শাহকে হত্যা করে আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে বাংলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। হোসেনশাহী বংশ ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল। হোসেনশাহী আমল বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তুর্কী আক্রমণের প্রাক্কাল থেকে হোসেনশাহী রাজবংশ (১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আটটি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। আমরা এই কালপর্বের একটা মোটামুটি রূপরেখা

উল্লেখ করতে পারি। তবে উল্লিখিত সন-তারিখ সম্পর্কে মতদ্বৈততার অবকাশ আছে। এখানে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (প্রথম খণ্ড) শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত 'সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়' ও ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় রচিত 'বাংলার মুসলিম শাসনের আদিপর্ব' গ্রন্থ অনুসরণে নিম্নলিখিত তালিকা তৈরী করা যেতে পারে ঃ

ক) খিলজী আমীর-ওমরাহদের অধীনে বাংলা - (১২০৩-১২২৭ খ্রীষ্টাব্দ)

১। ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খিলজী। (১২০৩-১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ)

২। আলাউদ্দীন আলিমর্দান (১২০৬-১২১৩ খ্রীষ্টাব্দ)

৩। গিয়াসউদ্দিন ইয়াজ খিলজি। (১২১৩-১২২৭ খ্রীষ্টাব্দ)

খ) দিল্লীর সুলতানের অধীনে বাংলা (১২২৭-১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দ)

১। মামলক শাসন (১২২৭-১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)

২। বলবন শাসন (১২৬৮-১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ)

গ) ইলিয়াসশাহী বংশের অধীনে বাংলা, প্রথম ধারা (১৩৪২-১৪১২ খ্রীষ্টাব্দ)

১। শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)

২। সিকন্দর শাহ (১৩৫৮-১৩৯১ খ্রীষ্টাব্দ)

৩। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯১-১৪১০ খ্রীষ্টাব্দ)

৪। সৈফুদ্দিন হাম্‌জা শাহ (১৪১০-১৪১২ খ্রীষ্টাব্দ)

ঘ) বায়াজিদ বংশের অধীনে বাংলা (১৪১২-১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ)

১। শিহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহ (১৪১২-১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ)

২। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ)

ঙ) রাজা গণেশের রাজবংশের অধীনে বাংলা (১৪১৪-১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দ)

১। গণেশ দনুজমর্দ্দনদেব (১৪১৫,১৪১৭-১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ)

২। যদু. জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ (১৪১৫-১৬, ১৪১৮-১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দ)

৩। মহেন্দ্রদেব (১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ)

৪। শামস্‌উদ্দিন আহম্মদ শাহ (১৪৩১-১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দ)

চ) মামুদশাহী বংশ বা ইলিয়াসশাহী বংশের অধীনে বাংলা, দ্বিতীয় ধারা (১৪৪২-১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)

১। নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দ)

২। রুকনুদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)

৩। শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ)

৪। সিকন্দর শাহ (১৪৮০-১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দ)

৫। জালালউদ্দিন ফতে শাহ (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)

ছ) হাবশী সুলতানদের অধীনে বাংলা (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)

১। বারবক সুলতান শাহ্‌জাদা (১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)

২। সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৪৮৭-১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ)

৩। নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ (১৪৯০-১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দ)

৪। শামস্‌উদ্দিন মুজাফ্‌ফর শাহ (১৪৯১-১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)

জ) হোসেনশাহী বংশের অধীনে বাংলা (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)

১। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ)

২। নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ - (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ)

৩। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ- (১৫৩২-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)

৪। গিয়াসউদ্দিন মামুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)

তুর্কী আক্রমণের প্রাক্কাল থেকে দেড়'শ-দু'শ বছর ধরে বাংলার বুকে রাজনৈতিক ঘনঘটা চলেছিল। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেড়'শ বছর কালসীমা বাংলার রাজনৈতিক আকাশে কখনো আমীর-ওম্‌রাহগণ কখনো দিল্লীর সুলতানগণ বাংলার ভাগ্যকে নিয়ে খেলা করেছে। বাংলার ইতিহাসে এই দেড়'শ বছর সময়কাল যুগসন্ধিকাল বা অন্ধকারপর্ব নামে চিহ্নিত। ইউরোপীয় ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার ইতিহাসের সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন ঐতিহাসিকগণ, ২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রোম সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, হুণ ইত্যাদি বর্বর জাতির আক্রমণে রোমীয় হেলেনিক সভ্যতার পতন ঘটেছিল, শিক্ষা-সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আসলে ধর্মীয় ও রাজতন্ত্রের তীব্র অনুশাসনের ফলে সভ্যতা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, মানুষের স্বাভাবিক চেতনার বিকাশ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং বহিরাগত বর্বর শক্তিকে প্রতিরোধের ক্ষমতা ছিল না। এ যুগটি ইউরোপের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত[২]। তুর্কী আক্রমণের প্রাক্কালে প্রায় দেড়'শ বছর কালপর্ব বাংলার ইতিহাসে 'যুগসন্ধিকাল' বা 'অন্ধকার যুগ' নামে চিহ্নিত। প্রাচীন যুগের রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস, মূল্যবোধের সর্বক্ষেত্রেই অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল; কিন্তু মধ্যযুগের শুরুতেই সাহিত্য, সংস্কৃতিতে নতুন জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া গেল। বাঙালীর দেবভাবনা, মূল্যবোধ, আচার-বিচারগত ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত রূপ গড়ে উঠার প্রয়াস পেয়েছিল। আসলে ঐ অবক্ষয়ের অন্তরালে চলেছিল ভবিষ্যতের প্রস্তুতি পর্ব — যা পরবর্তীকালে উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়া মাত্র ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। এই কালপর্বটিকে তাই অন্ধকার যুগ না বলে বাঙালীর মানস-প্রস্তুতিকাল বলে চিহ্নিত করা চলে।

তুর্কী আক্রমণের অনেক পূর্বে নবম-দশম শতাব্দীতেই বাঙালীর জাতি গঠনের কাজ শেষ হয়েছিল এবং পাল ও সেন যুগে বাংলার সংস্কৃতি নানা ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে একটি সমন্বয়ের সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তুর্কী বিজয়ের ফলে রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন ঘটলেও বাংলার গ্রামজীবন নিস্তরঙ্গ ছিল। পাল ও সেন যুগে রাজ আনকুল্যে এবং ভূস্বামীদের দ্বারা বৌদ্ধ বিহার, সঙ্ঘারাম, হিন্দুর মঠ-মন্দির গঠিত হয়েছিল। বাংলার সংস্কৃতিচর্চা রাজসভাগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল, এছাড়াও বাংলার লৌকিক জীবনে, লৌকিক প্রেরণায় সাংস্কৃতিক বাতাবরণ গঠিত হয়েছিল। বাংলার আর্য ও অনার্য গোষ্ঠী তথা উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে কোন রকম সাংস্কৃতিক, সমাজনৈতিক আদান-প্রদান ছিল না. অনার্যগণ বরাবর ব্রাত্য রূপেই চিহ্নিত হয়ে এসেছিল। ডঃ সুকুমার সেন বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেছেন - "নবীন স্তরের ব্রাহ্মণেরা ও তাঁহাদের শিষ্য-ভৃত্যেরা ছিলেন সংস্কৃতাশ্রয়ী আর প্রবীণ ব্রাহ্মণ- অব্রাহ্মণেরা ছিলেন প্রাকৃতশ্রয়ী এবং কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মমতে নিষ্ঠাহীন। অনেকেই জৈন বৌদ্ধ অথবা যোগপন্থী ছিলেন। মনোধর্মের দিক দিয়া নবীনেরা ছিলেন চিন্তাশীল শাস্ত্রাদর্শবাদী যজ্ঞ বা পূজাপরায়ণ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও সংযমনিষ্ঠ, আর প্রবীণেরা ছিলেন দৈববাদী ব্রতপরায়ণ কর্মস্পৃহালু ভাববিলাসী সঙ্গীতসাহিত্যরসলিপ্সু ও অধ্যাত্মনিষ্ঠ।"[৩] প্রাক্ তুর্কী আক্রমণ পর্বে বাংলার উচ্চবর্ণের সমাজ নিম্নবর্ণের সমাজকে নানা বর্ণে ও শ্রেণীতে ভাগ করে অবদমিত করে রেখেছিল। বৌদ্ধরাও সেন শাসনকালে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়েছিল। তুর্কী আক্রমণের ফলে বাংলার গ্রামীণ জীবনে পরিবর্তন না হলেও পুরাতন সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন— "বাঙালির সংস্কৃতি-জীবনের এই দুই পীঠই পর্যুদস্ত হল। বাঙালি, বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু নূতন তুর্কি রাজসভা ও অভিজাতদের আনুকূল্য পেল না। এদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হতেই বহু বৎসর কেটে গেল।"[৪] নবাগত রাজশক্তির সহায়তায় বৌদ্ধ ও হিন্দুদের কখনো বলপূর্বক, কখনো অর্থলোভে ধর্মান্তরিতকরণের পালা চলেছিল।

বৌদ্ধ বিহার, মঠ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি বিনষ্ট হল। হত্যালীলা, রক্তপাত, খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ নির্বিবাদে চলতে থাকল। বস্তুত মুসলমানগণ হিন্দু কাফেরদের হত্যা, ধর্মান্তরিতকরণ, মঠ-মন্দির-দেববিগ্রহ- ধর্মগ্রন্থ ধ্বংস করাকে পূণ্যকর্ম বলে মনে করেছিল। রাজধানী থেকে দূরবর্তী গ্রামগুলিতে মুসলমান পীর, গাজী, ফকিরের দল আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল। তারা রাজশক্তির সমর্থন পুষ্ট হয়ে বলপূর্বক ব্রাহ্মণদের জাতিনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল। রাজা গণেশের মত শাসকও তা থেকে রেহাই পেলেন না। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাধা দিলে তার ফল হত আরও ভয়াবহ। হয় ধর্মত্যাগ করে আত্মরক্ষা, নয় প্রাণত্যাগ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।চর্তুদশ- পঞ্চদশ শতকের কবি বিদ্যাপতি তাঁর 'কীর্তিলতা' নামক গ্রন্থে তুর্কী শাসনব্যবস্থার প্রত্যক্ষ চিত্র অঙ্কন করেছেন। বিদ্যাপতি লিখেছেন- — "কতহুঁ তুরুক বরকর।/ বাট জাইতেঁ বেগার ধর॥/ধরি আনএ বাঁভন বড়ুআ।/মথাঁ চড়াবএ গাইক চড়ুআ॥/ ফোট চাট জনউ তোড়।/উপর চড়াবএ চাহ ঘোড়॥/ধোআ উড়িধানে মদিরা সাঁধ।/দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ॥/ গোরি গোমঠ পূরলি মহী।/ পদরহ দেবাক ধাম নহী॥/ হিন্দু বোলি দূরহি নিকার।/ ছোটেও তুরকা ভভকী মার॥"[৫] অর্থাৎ কত তুরুক পথে যেতে বেগার ধরে, বড়ু ব্রাহ্মণকে ধরে এনে মাথায় চড়িয়ে দেয় গরুর রাঙ। ফোঁটা চাটে, পৈতে ছেঁড়ে, ঘোড়ার উপরে চড়াতে চায়, ধোয়া উড়িধানে মদ চোলাই করে, দেউল ভেঙে মসজিদ গড়ে, গোরে ও গো-মঠে মহী পরিপূর্ণ হল, পা দেবার একটুও স্থান নেই। হিন্দুকে বলে, দূর নিকাল, তুরুক ছোট হলেও বড়কে মারতে চায়। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে লিখেছেন- "মুসলমান আক্রমণকারীরা হিন্দুদের পরাজিত করে অধিকাংশকেই নির্বিচারে হত্যা করত, ধর্মের বিনিময়ে কেউ কেউ কোনো প্রকারে প্রাণভিক্ষা পেত। ধর্মান্তরীকরণের ফলে সমাজে দ্রুত মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল।"[৬] অন্যভাবেও মুসলমান সমাজের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। শুধু যে পীর-ফকির-দরবেশদের সহায়তায় হিন্দু সম্প্রদায়কে কৌশলে বা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হত তাই নয়, তারা সূক্ষ্ম কূট-কৌশল প্রয়োগ করত. অনেক সময় হিন্দুর দেব মন্দিরের পাশে মসজিদ, পীরের দরগাহ স্থাপন করত। সেখানে তারা তুক্তাক্, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-তাগা ইত্যাদি বিতরণ করে সাধারণ নিম্নবর্ণের হিন্দুকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করত। হিন্দুর মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মিত হলেও বিশেষত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা পূর্বতন সংস্কার বশত পীরের দরগায় প্রদীপ জ্বালাত, শীর্ণি দিত। অবশ্য পীর ও গাজী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সৎ এবং উদার মনোভাবের পরিচয় দিত। পীর-দরবেশদের মহিমার কথা প্রচার করত, ফলে হিন্দুসমাজে তথা কথিত অন্ত্যজ-অপাঙ্‌ক্তেয় হিন্দুরা ইসলামের সাময়িক উদারতায় মুগ্ধ হয়ে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলামধর্ম গ্রহণ করত। কেননা উচ্চবর্ণের হিন্দুর সঙ্গে নিম্নবর্ণের তথা কথিত অন্ত্যজ হিন্দুর কোন সামাজিক সম্পর্ক ছিল না, এমন কি তারা সামান্যতম মনুষ্যত্বের অধিকারটুকুও লাভ করেনি। তাছাড়াও একবার কেউ জাতিচ্যুত হলে হিন্দুসমাজ তাকে আর কোন দিনই গ্রহণ করত না।. একারণেই রাজা গণেশের পুত্র যদু ইসলামধর্ম গ্রহণের পর 'সুবর্ণধেনু' প্রায়শ্চিত্ত করলেও হিন্দুসমাজে গৃহীত হননি। সুতরাং রাজা গণেশের মত ক্ষমতাবানকেও সমাজে নিগৃহীত হতে হয়েছিল। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার এ সম্পর্কে বলেছেন— "হিন্দু সামাজিক সংস্থার নির্মম বিধানে যারা নির্যাতিত হচ্ছিল,— বর্ণসমাজের অন্তর্গত নিম্ন বর্ণগুলি এবং বর্ণসমাজের বাইরের অস্পৃশ্য জাতিগুলি— তারা ইসলামিক সমাজ-সংস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করে সমাজিক নির্যাতন থেকে মুক্তিলাভ করেছে। হিন্দু সমাজের বিধানদাতাদের নিকট যারা ছিল শূদ্র এবং অস্পৃশ্য পর্যায়ের, ইসলাম তাদের দিলো মুক্ত মানুষের অধিকার, এবং শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণদের উপরেও প্রভূত্ব করার ক্ষমতা।- - - - - - - তুলনায় মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতি ছিল প্রগতিশীল, আর সেজন্য তার বিজয়ও হয়েছে অপ্রতিহত। সমাজিক চিন্তাধারার এই উদারতা এবং সমানাধিকারের আদর্শই ভারতের সমাজেতিহাসে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদন।"[৭] অবশ্য প্রথম দিকে হিন্দুসমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের কোন প্রকার প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, কিন্তু ধীরে ধীরে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে থাকে। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করার ফলে

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে উঠতে থাকে। এর ফলে দেখা যায় মুসলমান শাসকের দরবারে হিন্দুরাও রাজকর্মচারীর পদ গ্রহণ করে, মুসলমান সুলতানগণ অনেক সময় হিন্দু জ্ঞানী-গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং তাদের উপাধি দিয়ে সম্মানিত করতেন। রুকনুদ্দিন বারবক শাহ মালধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁন' উপাধি দিয়ে ভূষিত করেছিলেন। হিন্দু কবিগণও এই সুলতানদের প্রচুর প্রশংসা করেছেন।

হিন্দুধর্মের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আঘাত, শাসকশক্তির মদত, বৌদ্ধধর্মের বিলোপ, এবং ইসলামধর্ম গ্রহণের বাস্তব সুবিধা বাংলার সমাজে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। প্রাচীনকাল থেকেই বৌদ্ধধর্ম সমাজের অভ্যন্তরে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছিল। সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা জনজীবনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। সহজিয়া বৌদ্ধ ও লৌকিক-অপৌরাণিক আচরণে প্রাকৃত জনসমাজ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এবং উভয় সমাজের মানুষ একে অপরের সঙ্গে সহাবস্থান করেছিল। এই দুই জনসমাজ একত্রিত হয়ে নতুন গোষ্ঠী ও জাতি গঠনের জন্য যে প্রচুর শক্তি ও আঘাত প্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছিল, তুর্কী আক্রমণ এই অনুঘটকের কাজটি করেছিল। এর ফলে সমাজের উচ্চকোটি থেকে ব্রাহ্মণ্য শক্তির অবনমন ঘটল এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত হল। সাধারণ জনসমাজ নবাগত ধর্মকে গ্রহণ করতে আগ্রহী হল। বাঙালী হিন্দুসমাজের এই বিপর্যয়ে ইসলামের আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে চলেছিল। এটাই ছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাঙালী হিন্দুসমাজের বাস্তব রূপচিত্র। তৎকালীন পরিস্থিতিতে সমাজ ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলিকে ডঃ গোপাল হালদার নিম্নসূত্রে বিধৃত করেছেন[৮] —

১। উচ্চ ও নিম্ন বর্গের হিন্দুদের মধ্যে সংযোগ নিকটতর হল।

২। পরাজিত হিন্দুসমাজ সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনা করে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হল।

৩। প্রথমে হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্য এবং তারপর হিন্দু-মুসলমান উচ্চবর্গের মধ্যেও যোগাযোগ স্থাপিত হল। ফল স্বরূপ মুসলমান বিজেতারা ধীরে ধীরে হয়ে উঠল বাঙালী, রইল না আর বিদেশী।

তুর্কী আক্রমণের আরো একটি বড় রকমের ফলশ্রুতি— বাঙালী সমাজ আরও বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করার সুযোগ পেল অর্থাৎ নিজস্ব গ্রামজীবনের বাইরে বৃহত্তর দেশ-কালের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেল। বাঙালী জীবনের মূল ভিত্তি ছিল গ্রামজীবন ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। তুর্কী আক্রমণ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে ভাঙনের ঢেউ নিয়ে এল, ফলে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে সর্বপ্রথম সর্ব ভারতীয় অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অবকাশ পেল আর সাংস্কৃতিক জীবনের উপর তার প্রভাব হয়েছিল অত্যন্ত ব্যাপক। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক দিক্ থেকে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ বণিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। বণিক শ্রেণীর মাধ্যমে পরিবর্তনশীলতায় আস্থাবান এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন—" মানুষ যতটা না তার ধর্ম, জাত্যভিমান, দেশাচার ও দেশাচারগত বিধিনিষেধ দ্বারা পরিচালিত হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী আকৃষ্ট হয় বহু মানুষের মেলামেশা সঞ্জাত ভাবতরঙ্গের প্রতি। লক্ষ্য তার স্বার্থ,পণ্যের লেনদেন থেকে লাভবান হওয়া; পাথেয় তার মেলামেশার মনোভাব, প্রীতি । এই গরজের টানে যখন সে অন্যের অভিজ্ঞতা ও কথাবার্তা চলনবলন আচারের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেয়, তখন সে বিস্মিত হয়ে দেখে পারস্পরিক অভিজ্ঞতায় গড়মিলের চেয়ে ঐক্য বেশী। তাদের ইন্দ্রিয়াভিজ্ঞতা এক । ঐ একের খাতিরেই অজ্ঞাতসারে গড়মিলের বাধাগুলি ধীরে ধীরে খসে পড়ে, সে সংস্কারবর্জিত হয়ে বহু মানুষের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে। অর্থাৎ, বণিক-সমাজের অনুকূল নব- মানবতার হয় বিবর্তন।"[৯] একটা বিষয়ে সুস্পষ্ট হওয়া গেল যে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ নিম্নবর্ণের মানুষকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখলেও এতদিনে তা দূর করতে বাধ্য হয়েছিল বিধর্মী ও বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনের হাত থেকে নিজ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে । অন্ধকার যুগের প্রায় দেড়'শ বছর পরে বাঙালী সমাজ সমন্বয়বাদী আদর্শ

গ্রহণের মধ্যে দিয়ে প্রতিরোধের প্রস্তুতিভূমি রচনা করেছিল। এই প্রতিরোধ সম্পূর্ণভাবে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ। বাঙালীর সংস্কৃতিতে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু, বিবাহ, পোশাক, পরিচ্ছদ, সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-বিচার, চরিত্র-মানসিকতার একটা নির্দিষ্ট নিজস্ব রূপ গড়ে উঠেছিল। এযুগের সংস্কৃতির এই সমন্বিত রূপ সামগ্রিকভাবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে প্রথমেই আসে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর কথা। বর্ণহিন্দু সমাজের চোখে অন্ত্যজ হিন্দুরা ব্রাত্য থাকলেও কিন্তু তাদের অপৌরাণিক-আর্যেতর লৌকিক দেবদেবীরা আর ব্রাত্য থাকেনি। মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর অনার্য-অপৌরাণিক স্তর থেকে সমাজের উচ্চকোটিতে স্থান পেল। মনসা, চণ্ডী, লৌকিক-শিব, কামকেলিযুক্ত কাব্যের নায়ক কৃষ্ণ ইত্যাদির দেবমাহাত্ম্য সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত হল; শুধুমাত্র ধর্মঠাকুরের সংস্কার পূর্ণ না হওয়াতে সমাজের সর্বস্তরের স্বীকৃতি পেল না। আবার কিছু লৌকিক দেবী যথা শীতলা, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, সুবচনী, এদের উপর আর্য সংস্কারের প্রলেপ না লাগলেও এরা অনার্য রূপ বজায় রেখেই সমাজের অন্তঃপুরে মহিলা মহলে স্থান করে নিতে পেরেছিল। ব্রাহ্মণ্য আর্য সংস্কার, পূজাবিধির প্রভাব সামান্যতম হলেও এদের উপরে পড়েছে এবং বাঙালী হিন্দুর ঠাকুরঘরে স্থান করে নিতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, সর্বস্তরের মিশ্রণের ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম, দেবদেবী ও আর্যসংস্কার লৌকিক সমাজেও গৃহীত হয়েছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বিষয়টিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-- "মধ্যযুগের বাংলার সমাজ এই নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি সংস্কারকে একসূত্রে গাঁথিয়া দেবার চেষ্টা করিয়াছে। বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কি ভাবে একদেহে লীন হইয়া আছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয়।"[১০] এই মিশ্রণের ফলে ব্যাধ সমাজের দেবী, ব্রতকথার হারানো বস্তু ফিরে পাওয়ার দেবী চণ্ডী হল শিব ঘরণী চণ্ডী, কোন কোন কবির কল্পনায় মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আদর্শে মঙ্গলাসুর বধকারিণী চণ্ডী। অনার্য দেবী, সিজগাছ পূজার দেবী,কৃষিজীবী সমাজের উর্বরতা শক্তির দেবী মনসা হল শিব দুহিতা, আর ধর্মঠাকুরের দেবপরিকল্পনায় আদিম রণ দেবতার পূজা, সূর্য দেবতার পূজা, প্রস্তরপূজা তাছাড়াও বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও শৈব ভাবনার মিশ্রণ ঘটে গেছে। তাছাড়া বৃক্ষপূজা, প্রস্তরপূজা, প্রাকৃতিক শক্তিপূজা, গ্রাম-দেবতার পূজা, বাস্তুপূজা, নানা ব্রতের দেবদেবী ও পূজা পদ্ধতি ক্রমে স্থান গ্রহণ করেছে আর সংমিশ্রণের পথে সকলকেই হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন নতুন দেবদেবীকে নিয়ে কবিরা নতুন নতুন কাব্য পরিকল্পনা করলেন। অন্যদিকে পৌরাণিক দেবগণও অপৌরাণিক, লৌকিক ভাব অঙ্গীকার করে নিয়েছিল এবং এদের মধ্যে প্রধান দুই দেবতা হল শিব ও কৃষ্ণ। পুরাণের রুদ্র-দেবাদিদেব মহাদেব হল বাংলার কৃষক সমাজের দেবতা, স্খলিত চরিত্র, গঞ্জিকাসেবী শিবঠাকুর; কৃষ্ণ চরিত্রের দেব সুলভ গৌরব নেই, সে শুধু ব্রজের রাখাল বালক মাত্র, কখনো বা কোন গোপ পল্লীর গোপ বালক মাত্র। অপরদিকে জনসাধারণের সামনে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য, ভারতীয় বীরধর্ম, আদর্শ, দর্শন, বিজয়গাথা তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। একদিকে যেমন পৌরাণিক দেবমাহাত্ম্য কথা কথক ঠাকুরের মুখে প্রচারিত হয়েছিল তেমনি রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ কাহিনীর মধ্যে দিয়ে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছিল। জনসমাজ তার মধ্যে তাদের জাতীয় নায়ককে খুঁজে পেল; বাস্তব জীবনের আদর্শ, পারিবারিক মহিমা, মানবিক সম্পর্ককে খুঁজে পেল। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তের ভাষায়- "দ্বিধাদীর্ণ বাঙালি ধর্মে ও আচরণে ঐক্যবদ্ধ হল। নির্জিত বাঙালি নূতন আদর্শে ও আশায় জাগরিত হল।"[১১]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ঃ ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা হলে মোটামুটি ভাবে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা

স্থাপিত হয় কিন্তু তা খুব বেশীদিন কার্যকর হয়নি।এই বংশের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ মামুদশাহী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে স্থায়ীভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের সুলতান নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ, রুকনুদ্দিন বারবক শাহ, শামস্উদ্দিন ইউসুফ শাহ প্রত্যেকেই সুশাসক ছিলেন। এরপরে হাবসী খোজারা কিছুদিন বাংলাদেশে তাণ্ডব চালিয়েছিল এবং ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুসেনশাহী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। হুসেনশাহী বংশের শাসনকাল বাংলাদেশে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেছেন। চর্তুদশ শতাব্দীর শেষপর্বে বাংলাদেশে যে সুস্থ পরিবেশ তৈরী হয়েছিল তার ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী । মাঝে মাঝে দুর্যোগ দেখা দিলেও মোটামুটি ভাবে রাজনৈতিক জীবনের যে সুস্থিরতা এসেছিল তাতেই তার সৃষ্টিভূমি পরিবর্তিত হয়েছে। চর্তুদশ শতকের শেষপর্ব থেকে পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকেই কৃত্তিবাসের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম আন্দোলনের প্রভাবে বাংলার সংস্কৃতিতে অভিনবত্বের সূচনা হয়। চৈতন্যদেবের প্রেম সাধনা বাংলার আকাশ-বাতাসকে সিক্ত করেছিল, তার ফলে সমাজ, সাহিত্য, শিল্পকলায় সর্বস্তরের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে। এপর্বের বাংলার ইতিহাসের কয়েকটি বিশেষত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তের প্রদত্ত সূত্রানুযায়ী,[১২] প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ্য ও লৌকিক দুই ধারার মিশ্রণে ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতি প্রতিষ্ঠা পেল। অন্ধকার পর্বের অস্থিরতার অবসানে জাতীয় জীবনে কতকটা স্থিতিশীলতা এসেছে। দ্বিতীয়তঃ প্রাক্-তুর্কী যুগে বাঙালী জাতি ও বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ ঘটলেও সম্যক প্রতিষ্ঠা হল পঞ্চদশ শতকে। বাঙালী জাতি সম্পূর্ণভাবে মাতৃভাষায় মনোভাব প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে এই পর্বে। তৃতীয়তঃ মুসলমান বাঙালীরাও এই পর্বে কাব্য রচনা শুরু করেন। চতুর্থতঃ এই পর্বে বাংলা সাহিত্যের অপর মুখ্য ধারাগুলির সূত্রপাত ঘটে। এই ধারাগুলি হল, যেমন- অনুবাদ সাহিত্য (রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত), মঙ্গলকাব্য (মনসামঙ্গল)এবং বৈষ্ণব সাহিত্য (বড়ু চণ্ডীদাস, পদাবলীর চণ্ডীদাস এবং অবাঙালী কবি বিদ্যাপতি)। বাংলা সাহিত্যের প্রধান শাখাগুলি চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

চৈতন্য-পররতীকালে অর্থাৎ অন্ত্য মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। আমরা সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্য ধারাগুলিকে সুস্পষ্টভাবে বিন্যস্ত করতে পারি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সুস্পষ্ট চারটি ধারা ছিল। এই ধারাগুলি হল— ১। অনুবাদ সাহিত্য ধারা। ২। মঙ্গলকাব্য সাহিত্য ধারা। ৩। বৈষ্ণব সাহিত্য ধারা
৪। লৌকিক সাহিত্য ধারা।

অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় দু'টি ভাগ ছিল— প্রথমতঃ সংস্কৃত পুরাণ-মহাকাব্য অনুবাদ, দ্বিতীয়তঃ হিন্দী ও ফার্সি গ্রন্থের অনুবাদ। সংস্কৃত পুরাণ ও মহাকাব্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত। হিন্দী ও ফার্সি গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছিল অনেক পরে আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে। বিশেষত রোমান্টিক প্রণয়কাব্য অনুবাদের নিজস্ব ধারা গড়ে উঠেছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলিকে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।[১৩] যথা— ১। বৈষ্ণবমঙ্গল ২। পৌরাণিক মঙ্গল এবং ৩। লৌকিক মঙ্গলকাব্য। বৈষ্ণবমঙ্গল কাব্যগুলি হল- চৈতন্যমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল, জগৎমঙ্গল, কিশোরীমঙ্গল, স্মরণমঙ্গল, গোকুলমঙ্গল, রসিকমঙ্গল, জগন্নাথমঙ্গল পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যগুলি হল— গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, কমলামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডিকামঙ্গল। লৌকিক মঙ্গলকাব্যগুলি হল— মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল ইত্যাদি।বৈষ্ণবমঙ্গল কাব্যগুলি নামে মঙ্গল

হলেও অন্তঃপ্রকৃতি ও বিষয়বস্তুগত ভিন্নতার জন্য যথাযথ মঙ্গলকাব্য নয়। অন্যভাবে মঙ্গলকাব্যগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— প্রধান মঙ্গলকাব্য ঃ মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল, আর অপ্রধান মঙ্গলকাব্য ঃ শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল ইত্যাদি।আমরা জানি পরবর্তীকালে সমাজ ইতিহাসের প্রয়োজনেই পৌরাণিক দেবদেবীকে নিয়েও মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে সুস্পষ্ট দু'টি বিভাগ— বৈষ্ণবপদসাহিত্য এবং চরিতকাব্য সাহিত্য। চরিতকাব্য সাহিত্যে চৈতন্য জীবনী চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল ইত্যাদি ছাড়াও স্বল্প পরিমাণে বৈষ্ণব মোহান্তদের জীবনী নিয়েও চরিত সাহিত্য রচিত হয়েছিল; যেমন- অদ্বৈত জীবনী, অদ্বৈতাচার্যের পত্নী সীতা দেবীর জীবনী ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞগণ লোকসাহিত্য বা লৌকিক সাহিত্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা— মুসলমানী সাহিত্য বা কিস্‌সা সাহিত্য, পল্লী গীতিকা বা গাথাকাব্য সাহিত্য এবং লোকসাহিত্য । এর বাইরে আছে বৈষ্ণবতত্ত্ব সাহিত্য, কুলজী সাহিত্য, নাথ সাহিত্য, শাক্তপদসাহিত্য ইত্যাদি।

অনুবাদ সাহিত্য ঃ অতঃপর বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভবও প্রকৃতির পরিচয় নেওয়া যাক্। তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী ভয়াবহ এক কালপর্ব অতিক্রান্ত হবার পর উপযুক্ত রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে বাংলায় নবজাগরণ শুরু হয়েছিল। সদ্য জাগরিত জাতি নতুন উদ্যম ও প্রেরণা নিয়ে উদ্দীপ্ত হলেও কিন্তু নতুন সৃষ্ট বাংলা ভাষা নতুন সাহিত্য সৃষ্টির উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। তাইতো সেকালের কবিগণ সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে রসদ সংগ্রহ করেছিলেন; প্রথম থেকেই অনুবাদের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন সম্পদ রামায়ণ, মহাভারতের মত মহাকাব্য ও ভাগবত, পুরাণ ইত্যাদির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হল। প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের কোন যোগাযোগ ছিল না; সংস্কৃত ভাষাও সাহিত্য থেকে অনুবাদের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষা পরিপুষ্ট হবার সুযোগ লাভ করেছে। অনুবাদ সাহিত্য এই সুযোগ পেয়েছে সর্বাপেক্ষা অধিক। বস্তুতপক্ষে, তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালে অন্ধকার যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্যেই অনুবাদ সাহিত্য উদ্ভবের প্রেরণা লুকিয়ে ছিল। বিধর্মী মুসলমান শক্তির কাছে পরাভূত হিন্দু শক্তি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতে তৎপর হয়েছিল। এই প্রতিরোধের মূল প্রয়াস ছিল পৌরাণিক ও অপৌরাণিক জনসমাজের সংমিশ্রণ। ইসলামের আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণ জনগণের সামনে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের আদর্শ তুলে ধরার প্রয়োজন হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণাদির প্রচার ছিল সাধারণত অভিজাত শিক্ষিত জনসমাজে; তাই অনুবাদের মধ্যে দিয়ে হিন্দুর আদর্শ ও বিজয় গৌরব প্রচার করার প্রয়োজন ছিল। এর ফলে লৌকিক জনজীবনে পৌরাণিক আচার-বিশ্বাস, আদর্শের প্রচার ঘটল। এই পর্বের কবিরা যুগগত প্রবণতা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত ছিলেন বলেই অনুবাদের মধ্যে দিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করে ছিলেন। এই কালপর্বে হিন্দুসমাজে এক জন জাতীয় নেতারও প্রয়োজন ছিল; রামায়ণ, মহাভারতে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রামচন্দ্র প্রমুখ চরিত্রে যুগোচিত জাতীয় নেতাকে খুঁজে পেয়েছিল। এই কালপর্বে নবাগত মুসলমান জনসাধারণ ও সুলতানগণ— ধীরে ধীরে তাদের ইসলামিক সংস্কৃতি থেকে বহুদূরে চলে এসেছিল; ফলে তারা ভারতীয় সংস্কৃতি, হিন্দুর আদর্শ ও হিন্দু বীরপুরুষদের বিজয় কাহিনী ও ঐশ্বর্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। এর ফলে মুসলমান সুলতানগণ হিন্দু কবির সাহায্যে রামায়ণ, মহাভারত অনুবাদ করিয়ে নেন সুলতান হুসেন শাহের সময়কালে চট্টগ্রামের শাসক পরাগল খাঁ এবং তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ যথাক্রমে সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে মহাভারতের অনুবাদ করিয়ে নেন। হুসেন শাহ

198550
29 AUG 2007

এবং তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ দু'জনেই পরধর্মসহিষ্ণু ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসু রুকনুদ্দিন বারবক্ শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। জানা যায় কৃত্তিবাসও কোন এক গৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন, কারও কারও মতে এই গৌড়েশ্বর ছিলেন রুকনুদ্দিন বারবক শাহ। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের প্রশংসা করে লিখেছেন—

"পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥"[১৪]

শুধুমাত্র রাজ-আনুকূল্যেই অনুবাদ হয়নি, সমাজ ইতিহাসের প্রয়োজনে, নিজেদের দায়বদ্ধতা হেতু, নিজের রসবোধের কারণেও কবিরা অনুবাদ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কবিরা কতটা যুগসচেতন ছিলেন তাঁদের কাব্যে তার পরিচয় আছে। মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" গ্রন্থে যবন শাসন ও অত্যাচারের কথা বলেছেন—

"ম্লেচ্ছ জাতি রাজা হব অধর্ম্ম পালিব।
জার ধন দেখিব তার সব হরি লব ॥"[১৫]

শুধু তাই নয়, তিনি হিন্দুর আদর্শ জাগরণের জন্য ভাগবতের অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তিনি লোক নিস্তার করতে চেয়েছিলেন। তাই মালাধর বসু লিখেছেন—

"ভাগবত-অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া॥
.. ..
গাহিতে গাহিতে লোক পাইব নিস্তার।
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার॥"[১৬]

ইসলামের অগ্রাসন রোধে পৌরাণিক ভাবাদর্শের প্রচার মালাধর বসুর প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা ছিল। আর কৃত্তিবাস বাঙালীর সংস্কার, রুচি, আদর্শবোধের অনুকূলে বাংলা রামায়ণ রচনা করেন। কৃত্তিবাস স্মার্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সুতরাং তাঁর রামায়ণ রচনার উদ্দেশ্য হল সমাজ সংগঠন । লোক বুঝাবার জন্য এবং ভগ্নপ্রায় বাঙালী সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে তিনি লিখেছেন—

"সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥"[১৭]

বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য ঃ বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে বৈষ্ণব মতবাদ ও বৈষ্ণবধর্ম অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। তুর্কী আক্রমণের পূর্ববর্তী যুগেই বাঙালী রচিত সংস্কৃত সাহিত্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ ছাড়াও কিছু কিছু ক্ষুদ্র প্রকীর্ণ কবিতায়, যথা কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত, হালের গাথাশপ্তশতী গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত কাহিনী পাওয়া যায়। চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালেই বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনের ফলে বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল। চৈতন্য-পূর্বকালেই বৈষ্ণবধর্ম নতুন পথে অগ্রসর হচ্ছিল; ভাগবতে উল্লিখিত বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে এই বৈষ্ণবধর্মের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকলেও কৃষ্ণভক্তির নতুন ধারাটি এসেছিল ভাগবত পুরাণ ইত্যাদির মধ্যে থেকেই। ডঃ সুকুমার সেনের মতে— "পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণভক্তির নূতন স্রোত বহিয়া আসিল ভাগবত-পুরাণের উৎস হইতে।" [১৮] এই স্রোতের মুখ খুলে দিয়েছিলেন মাধবেন্দ্রপুরী, তিনি

চৈতন্যদেবের আগমনের পথও প্রশস্ত করেছিলেন। বস্তুত অনুবাদের মধ্যে দিয়েই কৃষ্ণভক্তির নতুন পথ বাঙালী সমাজে খুলে গিয়েছিল। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণভক্তির ধারা লক্ষ করা গেলেও তা ভাগবতোক্ত ধারা নয়, কারণ মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য মূর্তি অঙ্কন করেছিলেন, বাঙালী সুধী সমাজ শ্রীকৃষ্ণের এই রূপকে গ্রহণ করেননি, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য রূপকেই ভালবাসতেন। তুর্কী বিজয়ের পূর্বেকার রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত রচনাগুলিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বলিত কাহিনী পাওয়া যায়। তুর্কী বিজয়ের পূর্ববর্তীকালে এমন কি চৈতন্যদেবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত ছিল তা পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্ম, যেখানে ভাগবত ও পুরাণে উল্লিখিত বিষ্ণু ও কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিশেষভাবে ছিল। কিন্তু বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে পুরাণোক্ত বৈষ্ণবধর্মের সম্বন্ধ ছিল না বলা চলে, কেননা তখন পর্যন্ত সমাজে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা পূজ্যস্থান অর্জন করতে পারেনি। কবিগণ ধর্মেও বৈষ্ণব ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী সেবক ছিলেন। বিদ্যাপতির ধর্ম নিয়ে মতানৈক্যের অবকাশ থাকলেও তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না, সম্ভবত বিদ্যাপতি পঞ্চোপাসক ছিলেন। পদাবলীর চণ্ডীদাস সম্ভবত সহজিয়া সাধক ছিলেন। চৈতন্যদেবের ধর্ম আন্দোলন বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্পর্ক স্থাপন করে। চৈতন্যযুগেই বৈষ্ণবপদকর্তাদের পদ রচনা সাধনার নামান্তর হয়ে পড়ে। চৈতন্য-পূর্ব কালে পৌরাণিক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্যগুলির সঙ্গে বৈষ্ণবপদসাহিত্যের সম্পর্ক ছিল না, তখন দুটি পৃথক ধারা ভিন্ন পথে চলেছিল। কিন্তু এযুগেই বৈষ্ণবপদসাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্টতা স্থাপনের প্রয়াসও চলতে থাকে। মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে কৃষ্ণনামের মহিমার কথা ঘোষণা করেন। মালাধর বসু লিখেছেন—

"উত্তম জাতি হৈল মালি কৃষ্ণের বরে।
জল আচরত যেন সংসার ভিতরে॥"[১১]

মালাধর বসুর কাব্যে কেউ কেউ বৈষ্ণবধর্মের পূর্বাভাস আবিষ্কার করেছেন। 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' এই পঙ্‌ক্তিটিকে আশ্রয় করে শ্রীচৈতন্যদেব ভাববিহ্বলতা বোধ করতেন । আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের শেষাংশে 'রাধা-বিরহ'তে কৃষ্ণ বিরহে উন্মাদিনী শ্রীরাধার সঙ্গে বৈষ্ণবপদাবলীর শ্রীরাধার সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে জয়দেবের কাব্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পরবর্তীকালীন কৃষ্ণলীলার যোগসূত্র রক্ষা করেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বৈষ্ণব ছিলেন না, আর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে যে ভক্তির প্রকাশ আছে তা বেদ নির্দেশিত বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তির সঙ্গে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট।চৈতন্যযুগে চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বৈষ্ণবপদসাহিত্য শাখায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটে । চৈতন্য-পূর্ব যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের ঐতিহ্যকে বহন করে প্রসারিত হলেও চৈতন্য পূর্ব ও পরবর্তীকালে বৈষ্ণবপদসাহিত্যে বিরাট পার্থক্য লক্ষ করা গেল । ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব সাহিত্য মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্পর্শ ও ভাব আন্দোলনের ফল। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দার্শনিক ব্যাখ্যার আলোকে গড়ে উঠল পরবর্তীকালীন পদাবলী সাহিত্য। এইপর্বে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব পদাবলীর নতুন শাখা বিস্তার লাভ করে। বৈষ্ণব সাধকগণ চৈতন্যলীলাকে ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণলীলার সঙ্গে এক দেখতে চাইলেন। রচিত হল গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী ও গৌরচন্দ্রিকা। অন্যদিকে বৈষ্ণবগীতি কবিতার পাশাপাশি শ্রীচৈতন্যদেবের ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠল চৈতন্য জীবনী সাহিত্য। অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চৈতন্যদেবের ধর্ম আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা গেল কাশীরাম দাসের মহাভারতে।

মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঃ এই আলোচনায় অগ্রসর হবার আগে আমাদের জানতে হবে

মঙ্গলকাব্য কি বা কাকে বলে? ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন - "বাংলার লৌকিক দেবতাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে সকল কাব্যের মধ্যে বাংলার সমাজ জীবনাশ্রিত নরনারী-চরিত্রেরই জয়গান করা হইয়াছে, তাহাদিগকেই বাংলার মঙ্গলকাব্য বলা হইয়া থাকে।"[২০] আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর বিকাশ, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের পর আর কেউ মঙ্গলকাব্য রচনা করেননি বা মঙ্গলকাব্য রচনা করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেননি। মঙ্গলকাব্যগুলি মূলত আখ্যান কাব্য, পল্লীর জনসভা থেকে উদ্ভব হলেও শেষ পর্যন্ত রাজসভাতেও তা সমাদৃত হয়েছিল। পল্লীকবির লেখনীপ্রসূত, মূলত দেবকথামূলক ধর্মাশ্রিত হলেও কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম বিশ্বাসের দ্বারা মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি হয়নি। যাই হোক্ ডঃ ভট্টাচার্যের মতে—"বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া বাংলাদেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে।"[২১]

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল পাল রাজাগণ বৌদ্ধধর্মের উপাসক হলেও তারা পরধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। সমাজের গভীরে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের অন্তঃশীলা প্রবাহ নিঃশব্দে বয়ে চলেছিল। সেন রাজাদের সময়ে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম প্রধান ধর্মে পরিণত হয়। তুর্কী বিজয়ের পরবর্তীকালে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে অনার্য-লৌকিক, অপৌরাণিক সংস্কৃতি সংমিশ্রণের সুযোগ লাভ করেছিল। বিশেষ আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধধর্ম, আর্য, অনার্য সংস্কৃতির মিলন হয়ে চলেছিল, আর তুর্কী আক্রমণের ফলে তার সঙ্গে যুক্ত হল নবাগত ইসলামধর্ম। ত্রিমুখী দ্বন্দ্বের ফলে ইসলামের প্রবল অভিঘাতে অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতিগত ভাবধারা ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে তুর্কী আক্রমণের অভিঘাতে বাংলার নিম্নকোটির জনসমাজ থেকে বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্নও লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছিল। জনসাধারণ উপলব্ধি করেছিল জীবন বাস্তবে শূন্য নয়; সেখানে ভয়-ভীতি, দারিদ্র্য আছে, তাই মানুষ লোকায়ত দেবদেবীর আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে যত্নবান হয়েছিল। এই সর্বস্তরের অরাজকতার মধ্যে লোকায়ত দেবদেবীর অভ্যুত্থান ঘটেছিল, অবশ্য তারা সমাজের গভীরে লোকসমাজে দীর্ঘকাল ধরে পূজিত হয়ে আসছিল। নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদেই সেদিন ব্রাহ্মণ্য সমাজ তাদের উন্নাসিকতা পরিত্যাগ করে নিম্নকোটির লোকায়ত দেবদেবীকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল; এর ফলে পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্মের মিশ্রণ ঘটল, এই মিশ্রণই মঙ্গলকাব্য রচনার ঐতিহাসিক প্রেরণা । এসমস্ত লোকায়ত দেবদেবীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল মনসা, চণ্ডী, বাশুলী, শীতলা, ষষ্ঠী, ধর্মঠাকুর ইত্যাদি । মিশ্রণের ফলে লৌকিক দেবতার আর্যীকরণ ঘটতে লাগল; ফলে পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে এদের সম্পর্ক স্থাপন করে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে তারা গৃহীত হল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বীকৃতি পেল। ডঃ অতুল সুর এ প্রসঙ্গে বলেছেন- —"আর্যসমাজের প্রধান দেবতসমূহ ছিল পুরুষদেবতা, আর আর্যেতর সমাজের প্রধান দেবতসমূহ ছিলেন নারীদেবতা। আর্যদেবতসমূহ যতই প্রাধান্যলাভ করতে লাগলেন, আর্যেতর এ সকল নারীদেবতসমূহ ততই পর্বতকন্দরে, ঝোপজঙ্গলে বা গাছতলায় আশ্রয়লাভ করলেন। কিন্তু মধ্যযুগে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তি টলমল করে উঠল, তখন এ সকল নারীদেবতা তাঁদের পর্বতকন্দর, ঝোপজঙ্গল ও গাছতলার আশ্রয় পরিহার করে ক্রমশ হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ধর্মসংস্কারের মধ্যে প্রবেশলাভ করতে লাগলেন। এই অনুপ্রবেশকে সহজ করবার জন্য তাঁদের পৌরাণিক মাতৃদেবীর সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপন্ন করা হল॥"[২২] সাধারণ মানুষ শাসকের শোষণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য এসমস্ত লৌকিক দেবতাকে আঁকড়ে ধরতে চাইল। এভাবে অলৌকিক শক্তিতে বলীয়ান দেবতার কল্পনা করে বাঙালী সেদিন আত্মতৃপ্তি অনুভব

করেছিল। এসমস্ত অমঙ্গলকারী দেবতার পূজা করলে, ভক্তি করলে সংসারের মঙ্গল হয় এই বিশ্বাস থেকে তারা হয়ে উঠল মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী । এভাবে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে লৌকিক সাহিত্যকে আশ্রয় করে একটা বিশিষ্ট সাহিত্যরীতি গড়ে উঠল, যেখানে স্থান পেল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাব-ভাবনা। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা কিন্তু স্বভাব চরিত্রে গোলোকবিহারী দেবতা নয়; স্বর্গের দেবতা মর্ত্য পৃথিবীর ধূলি-মাটির সংস্পর্শে এসে তাদের দেবসুলভ পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে রেখে মাটির কাছাকাছি মানুষ হয়ে উঠেছে। তাইতো পার্বতী কখনো পাটনীর বেশ ধারণ করে খেয়া পার করে, শিবঠাকুর কাঁধে লাঙল-জোয়াল নিয়ে হাল বইতে যায়; মনসা সাধারণ মানুষের মত ক্ষুদ্রচেতা ও ঈর্ষাপরায়ণ, সে স্বার্থসিদ্ধির জন্য হীনতা ও নীচতার পরিচয় দিতে পারে; তাছাড়া দেবদেবীরা অশিক্ষিত সাধারণ গ্রাম্য নরনারীর মত রুচিহীন, কলহপরায়ণ। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর স্বভাব পরিচয় প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র চরম কথা বলেছেন। দেবী অন্নপূর্ণা হরিহোড়কে বর দিতে চাইলে হরিহোড় বলেছে—

"হরিহোড় কহে মা গো কর অবধান।
চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলাসমান॥
অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে।
নিগ্রহ করিতে পুন বিলম্ব না সহে॥"(ভারত/১৪৬)

রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন- "এককালে পুরুষদেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়েদেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পূজো চাই। অর্থাৎ যে জায়গায় আমার দখল নেই, সে জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কী। গায়ের জোর। কী উপায়ে দখল করবে। যে উপায়েই হোক।"[২৩] মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের স্বরূপ সম্পর্কে সূত্রাকারে আলোচনা করা যেতে পারে- প্রথমতঃ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ পৌরাণিক দেবদেবী নয়; অনার্য-লৌকিক, অপৌরাণিক দেবদেবী; নানা প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে, নানা উপাদানের সংযোগে এদের উৎপত্তি । যেমন দেবী চণ্ডী ব্যাধ সমাজের শিকারের দেবী, মেয়েলী ব্রতকথার-হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার দেবী, অসাধ্য সাধনের দেবী, পশুসমাজের রক্ষয়িত্রী দেবী (আরণ্যক উপন্যাসে উল্লিখিত পশুসমাজের রক্ষয়িত্রী দেবী টাঁরবাড়ো হতে পারে)। মনসা সর্পপূজা, সিজগাছপূজা ও কৃষিজীবী সমাজের উর্বরতা শক্তির দেবী, প্রজনন শক্তির দেবী। ধর্মঠাকুরের মূলে আছে আদিম প্রস্তরোপাসনা, সূর্য আরাধনা; তাছাড়া রোগভীতি ও রোগ থেকে উপশমের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর পরিকল্পনা, যেমন বসন্তের দেবী শীতলা, ওলাওঠা বা কলেরা রোগের দেবী ওলাবিবি, বাঘভীতি থেকে বাঘদেবতা সোনা রায় বা বড়গাজী খাঁ-র সৃষ্টি।

দ্বিতীয়তঃ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর সঙ্গে সুউচ্চ আদর্শ বা দার্শনিকতার সম্পর্ক নেই। ইহলোকে সমৃদ্ধি এবং শেষে স্বর্গে গমন, সে স্বর্গও পৃথিবীর চাইতে অধিকতর ভোগ বিলাসিতার স্থান ছাড়া কিছু নয়। মোক্ষ বা মুক্তি দানে তাদের আগ্রহ নেই। হরিহোড় অন্নদার পাদপদ্মে ঠাঁই চেয়েছিল। কিন্তু দেবী তাকে জানায়—

"হাসিয়া কহিলা দেবী সে ত হবে শেষে।
কিছু দিন সুখভোগ করহ বিশেষে॥" (ঐ)

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা মানুষের কামনা-বাসনা পূর্ণ করে, ভয়ভীতি, রোগশোক দূর করে। তাই দেবী তুষ্ট হলে মঙ্গল, অসন্তুষ্টিতে অমঙ্গল হয়।

তৃতীয়তঃ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী চরিত্র রূপায়ণে হিন্দুর লৌকিক দেবী, বৌদ্ধতন্ত্রের দেবী ও পৌরাণিক দেবীকে সমন্বিত করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীকে পুরাণের দেবদেবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে কৌলীন্য প্রদান করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী মানবায়িত, তারা মানুষের মত রাগ-দ্বেষ, লোভ-হিংসা, দুঃখ-দারিদ্য সমস্ত মানবিক গুণাবলী দ্বারা পুষ্ট। মাঝে মাঝে দেব লক্ষণাক্রান্ত করতে গিয়ে তাদের চরিত্রে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের ভয়ে ভীত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের গঠনগত ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যে কতকগুলি প্রথাসিদ্ধ রীতি অনুসৃত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে সমস্ত মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছে তার বিষয় পরিকল্পনায় কতকগুলি সাদৃশ্য চোখে পড়ে। বস্তুত কোন বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ করে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়নি, পরবর্তীকালে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যকে বিচার করে কতকগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তাই দেখা যায় সকল বৈশিষ্ট্যগুলি কোন একটি মঙ্গলকাব্যে অনুপস্থিত। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি সংস্কৃত পুরাণ সাহিত্যেরই দূর সম্পর্কিত আত্মীয়, তাই বাংলায় পুরাণের আদর্শকে অনুসরণ করে মঙ্গলকাব্যের একটা গঠনগত রূপ গড়ে তোলা হয়েছে। আদর্শ মঙ্গলকাব্যে কয়েকটি বিভাগ রয়েছে, যেমন ১। গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা ২। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ও কবির আত্মপরিচয় বর্ণনা ৩। দেবখণ্ড এবং ৪। নরখণ্ড। এই গঠন বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বাংলার সমাজ ইতিহাসে অঙ্গীভূত হতে পারে, কারণ এতে বাংলার মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। বস্তুত বাংলার লৌকিক জীবনের বাস্তব ইতিহাস সম্মত পরিমণ্ডলই মঙ্গলকাব্যের গঠন নির্দিষ্ট করেছিল। মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে—

প্রথমতঃ প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের সূচনা হয়েছে গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা দিয়ে। কোন মঙ্গলকাব্যেই একজন দেবতার বন্দনা নেই, এখানে মঙ্গলকাব্য নির্দিষ্ট দেবদেবী ছাড়াও দেবদেবীর পক্ষীয় বা বিপক্ষীয় সমস্ত দেবদেবীর বন্দনা করা হয়েছে। মনসামঙ্গলে চণ্ডী ও মনসার দ্বন্দ্বই প্রাধান্য পেলেও কাব্যের শুরুতে চণ্ডী-আদ্যাশক্তি মহামায়ার বন্দনা করা হয়েছে। শৈব ও শাক্ত দ্বন্দ্ব প্রধান কাব্য চণ্ডীমঙ্গলের কবি শিব বন্দনা করেছেন তাছাড়াও চৈতন্য-পরবর্তীকালের কবিরা চৈতন্য বন্দনা, সর্ব দেবদেবী বন্দনা, এমন কি বিপ্র বন্দনাও করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে জন্ম হলেও কবির অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং সমাজের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সম্মিলনই মঙ্গলকাব্যে বড় হয়ে উঠেছে। এবং এতে সেকালের বাঙালীর ধর্মগত অবস্থান সম্পর্কেও ধারণা করা যায়। বস্তুত শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব যাই হোক না কেন বাঙালী পঞ্চোপাসক। কোন নির্দিষ্ট দেবতার প্রতি তাদের আস্থা নেই, তাই কবি বৈষ্ণব হলেও শাক্তদেবীর বন্দনা করতে ভোলেননি। যুগগত পরিবর্তনের ফলে ধর্ম সম্পর্কিত চেতনাও বদলে যায়, তাই চৈতন্য-পরবর্তীযুগের কবিগণ চৈতন্য বন্দনা করেছেন, আবার ভারতচন্দ্রের যুগগত প্রতিবেশ অনুযায়ী ভারতচন্দ্র দেবতাকে নিয়ে বিদ্রূপ তামাসা করেছেন; বন্দনা প্রথাসিদ্ধভাবে করলেও দেব-দ্বিজে তাঁর ভক্তির বহিঃপ্রকাশ নেই। মঙ্গলকাব্যগুলি হিন্দুর দেবকথামূলক কাব্য হলেও সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষই মঙ্গলগানের আসরে ভীড় করত, প্রত্যেকেই জাতীয় জীবনকথা সাগ্রহে শ্রবণ করত। মঙ্গলকাব্যের কবি তাই সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কথাই মঙ্গলকাব্যে তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয়তঃ মঙ্গলকাব্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা করা। প্রায় সব কবিই কাব্য রচনার কারণ হিসাবে দেবদেবীর স্বপ্নাদেশের কথা বলেছেন। মনে হয় দৈববাদী, ব্যক্তি- স্বাতন্ত্রহীন বাঙালীর পক্ষে

মধ্যযুগে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ভাবে কিছু করা সম্ভব ছিল না। তাই দৈবাদেশের কথা এসেছে; তাছাড়া মানুষের কাছে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জনের জন্য, গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দৈবাদেশের কথা এসেছে। এর ফলে মানুষের উৎসাহ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেত। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনায় কবির আত্মপরিচয় থাকত এবং আত্মপরিচয় সূত্রে কবি দেশ-কালের কথা বলতেন, ফলে একালের পাঠকের পক্ষে কবির সমকালের ইতিহাস জানা সম্ভব হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ মঙ্গলকাব্যের একটা অন্যতম অংশ দেবখণ্ড। এখানে থাকে সাধারণত সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা, দক্ষের শিব হীন যজ্ঞের আয়োজন . সতীর দক্ষালয়ে যাত্রা, শিবনিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, হিমালয় গৃহে সতীর জন্মগ্রহণ, মদনভস্ম, হরগৌরীর বিবাহ, হরগৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাযাত্রা ইত্যাদি এবং শেষে দেবদেবীর পূজা প্রচারের প্রচেষ্টা। তবে একমাত্র চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যেই এই অংশগুলি সুস্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত; অবশ্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে কবিকঙ্কণের কাব্যেই তা সুস্পষ্ট। দ্বিজ মাধবের কাব্যে এই বর্ণনার পরিবর্তে মঙ্গলাসুর বধের বৃত্তান্ত আছে। মনসামঙ্গলে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার পরেই মনসার জন্মকথা, পার্বতী মনসার দ্বন্দ্ব বর্ণিত। আর ধর্মমঙ্গলের দেবখণ্ড সুস্পষ্ট নয়। যাইহোক, দেখা যাচ্ছে মঙ্গলকাব্যগুলি দেবখণ্ড হয়ে নরখণ্ডে প্রবেশ করেছে। কারণ মঙ্গলকাব্যের দেবতারা অনার্য দেব-পরিকল্পনা থেকে উদ্ভূত ; অনার্য-অপৌরাণিক দেবকাহিনী মধ্যযুগীয় হিন্দুসমাজে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু সামাজিক সমীকরণের ফলে যখন অপৌরাণিক দেবদেবীর উত্থান ঘটতে থাকল তখন বর্ণহিন্দু সমাজে গ্রহণযোগ্য করার জন্য পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে অপৌরাণিক দেবদেবীর কৌলীন্য প্রাপ্তি ঘটানো হল, যদিও এর মধ্যে দিয়ে লৌকিক জীবনকথাই বড় হয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে শিবই একমাত্র দেবতা যার পৌরাণিক এবং লৌকিক দুই পরিচয়ই সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাই শিবের সঙ্গেই অন্যান্য দেবতার সম্পর্ক স্থাপন করতে দেখা গেল। এর মধ্যে দিয়ে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে অপৌরাণিক লোক-সংস্কৃতির মিলন ঘটানো হয়েছে ইতিহাসের প্রয়োজনেই। একথাও ঠিক যে বৌদ্ধধর্ম বিলোপের পর মঙ্গলকাব্যের যুগই হল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও ধর্মের পুণঃপ্রতিষ্ঠার যুগ। কিন্তু এই নবযুগে নিরঙ্কুশ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, মঙ্গলকাব্যে এই মিশ্র সংস্কৃতির প্রতিফলন দেখা যায়।

চতুর্থত ঃ মঙ্গলকাব্যের মস্তিষ্ক হল নরখণ্ড। এখানে দেবদেবীর পূজা প্রচারের প্রচেষ্টা দেখা যায়। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী কোন অপ্সর বা অপ্সরীকে শাপগ্রস্ত করে মর্ত্যে প্রেরণ করে থাকে, এখানে বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগের মধ্যে দিয়ে পূজা প্রচারের পর স্বর্গে গমন করে। স্বর্গের অপ্সর বা গন্ধর্ব মর্ত্যের ধূলিমাটির স্পর্শে সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে। নরখণ্ডে থাকে নায়কের চৌতিশা, নায়িকার বারমাস্যা, নারীগণের পতিনিন্দা, কাঁচুলি নির্মাণ প্রসঙ্গ, নায়িকার রন্ধন বর্ণনা, বিবাহাচার বর্ণনা ইত্যাদি সমাজ ইতিহাসের তথ্য সমৃদ্ধ উপকরণ। লোকজীবন সম্ভূত এ সকল বর্ণনা সমাজ ইতিহাসের দলিল, তাই মধ্যযুগীয় ইতিহাসের বহু অপ্রাপ্ত তথ্যের শূন্যস্থান পূরণ করেছে এই মঙ্গলকাব্যগুলি। মঙ্গলকাব্য (কি দেবখণ্ড, কি নরখণ্ড) বর্ণনায় কবি যে সমস্ত পরিভাষাগুলি ব্যবহার করেছেন, যাকে আমরা মঙ্গলকাব্যের বিশেষত্ব বলে চিহ্নিত করে থাকি, সেগুলিতে সমাজ ইতিহাসের বহু সত্য লুকিয়ে আছে। অপ্সর-অপ্সরীর মানব ঘরে জন্মগ্রহণ, বণিক শ্রেণীর আধিপত্য, শিব-শক্তির দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়গুলিতে বহু ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে যা আমরা পরে আলোচনা করব।

ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্য ঃ মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে লোককথা ও লোকসাহিত্যের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে; এদিক থেকে ব্রতকথা, রূপকথাগুলি মঙ্গলকাব্যের পরমাত্মীয়। ব্রতকথাগুলির মধ্যেই মঙ্গলকাব্যের বীজ লুকিয়ে

ছিল। মঙ্গলকাব্যগুলির উৎস সন্ধানে পুরাণ সাহিত্যের কথাও উঠতে পারে; এমন কি কোন কোন দিক থেকে মঙ্গলকাব্যগুলিকে পুরাণ সাহিত্যের অত্যন্ত ঘনিষ্ট হতে দেখা যায়।পুরাণ সাহিত্যে আমরা পৌরাণিক দেবতার প্রাধান্যের কথাই পাই, এখানে পৌরাণিক দেবতার বিজয়গাথা প্রচার করা হয়েছে, আর মঙ্গলকাব্যগুলির লক্ষ্যেও কিন্তু ঐটিই অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যে অপৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই মূল লক্ষ্য, কিভাবে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর পূজা পৃথিবীতে প্রচারিত হল সেকথাই মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে উপজীব্য। মঙ্গলকাব্যের দু'টি মূল অংশ, দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। দেবখণ্ডে আমরা সম্পূর্ণভাবে পৌরাণিক দেব কাহিনী পাই, সেখানে লৌকিক দেবদেবীর কোন প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়নি। অবশ্য এর মধ্যে দিয়ে সমাজ ইতিহাসের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে অপৌরাণিক লৌকিক দেবদেবীর সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে অপৌরাণিক দেবদেবীর আর্যীকরণ বা পৌরাণিকীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়াও আমরা দেখি বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে প্রচুর পৌরাণিক কাহিনী ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী অংশে দেখা যায় কাহিনী কখনো রামায়ণের রাম কাহিনীর মত, কখনোবা মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের কাহিনীর মত করে গ্রথিত করা হয়েছে। সুতরাং মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক প্রভাব ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করা যায় না। মঙ্গলকাব্য উদ্ভবের মূলে পুরাণ সাহিত্যের গভীর প্রভাব থাকলেও কিন্তু উভয় সাহিত্য শাখায় বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। প্রথমতঃ মঙ্গলকাব্য ও পুরাণ সাহিত্য উভয়ই দেবকথায় পরিপূর্ণ হলেও পুরাণগুলি দেবতার কীর্তিকলাপেই পূর্ণ, সেখানে মানুষের কথা স্থান পায়নি। অপরদিকে মঙ্গলকাব্যের দেবকথা থাকলেও সেখানে দেবকথার মোড়কে মানবকথাই পরিবেশিত হয়েছে, দেবতা এখানে উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য কিন্তু মানুষ।

দ্বিতীয়তঃ মঙ্গলকাব্যগুলি সমকালীন সমাজ ইতিহাসের যেন জীবন্ত দলিল; বাস্তব জীবন ও পরিমণ্ডলকে বাদ দিয়ে মঙ্গলকাব্য পূর্ণ হতে পারে না; অথচ পুরাণগুলিতে সমকালের সমাজ ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্র পাওয়াও সাধারণভাবে দুষ্কর; মঙ্গলকাব্যগুলি পুরাণ অপেক্ষা তাই অনেক বলিষ্ঠ জীবনবোধে ভরপুর।

মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে লোকসাহিত্যের যোগ অতি ঘনিষ্ট; বাংলার লৌকিক ব্রতকথাগুলি লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ। ব্রতকথাগুলির সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের যোগাযোগ আছে, বলা যায় ব্রতকথাগুলিই মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবমূলে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। এখন দেখা যাক্ ব্রতকথা আসলে কি? 'ব্রত' শব্দটি 'বৃ' ধাতুর সঙ্গে 'অত্ ' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ব্রত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল তপস্যা, নিয়ম, সংযম। ডঃ শীলা বসাকের মতে— "সাধারণত কোন কিছু কামনা করে দেবতার কাছে বিশেষ প্রার্থনা জানিয়ে কোন বিশেষ আচার পালন বা অনুষ্ঠান করা কিংবা পার্থিব কল্যাণ কামনায় 'দশে মিলে' যে সামাজিক নিয়ম বা অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাকেই ব্রত বলা হয়। তাই ব্রত হল নিয়ম-সংযমের মধ্যে দিয়ে কামনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান।"[২৪] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- "কিছু কামনা ক'রে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।"[২৫] আবার 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে' বলা হয়েছে. ব্রত হল— "পুণ্যলাভ ইষ্টলাভ পাপক্ষয় প্রভৃতির জন্য অনুষ্ঠিত ধর্মকার্য, ধর্মানুষ্ঠান; তপস্যা; সংযম।"[২৬] নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছেন—"ব্রত কথাটির অর্থই বোধ হয় আবৃত করা, সীমা টানিয়া পৃথক করা; নির্বাচন করাই ব্রতের উদ্দেশ্য; বরণ কথাটিরও একই ব্যঞ্জনা। ব্রতানুষ্ঠানে আলপনা দিয়া অথবা বৃত্তাকারে সীমারেখা টানিয়া দিয়া ব্রতস্থান চিহ্নিত করিয়া লওয়া হয়; এই সীমারেখা টানা, স্থান নির্বাচন বা চিহ্নিত করার মধ্যে জাদুশক্তি বা ম্যাজিকের বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন।"[২৭] তাহলে দেখা গেল ব্রত হল কামনা-বাসনার অনুষ্ঠান। ব্রতের অনুষ্ঠান করলে ঐহিক

ও পারত্রিক লাভ হয়। তবে লক্ষণীয়, বাংলাদেশে প্রচলিত ব্রতগুলি সাধারণ মানুষের ইহলৌকিক বা ঐহ্যিক কামনা-বাসনা পূরণের অনুষ্ঠান। সাধু-সন্ন্যাসীগণ ঈশ্বর দর্শনেচ্ছায় বা অভীষ্ট সিদ্ধিলাভের কারণে ব্রতানুষ্ঠান করে, তাতে তাদের পারত্রিক কল্যাণ লাভের আকাঙ্ক্ষাও থাকে। বাংলাদেশে প্রচলিত ব্রতগুলি মূলত সাধারণ মানুষের কামনা-বাসনা, সুখ-সমৃদ্ধি, পুণ্য অর্জন, পাপক্ষয়ের জন্য কৃত অনুষ্ঠান। যারা ব্রতের অনুষ্ঠান করে থাকে তাদের বলা হয় ব্রতী। ডঃ শীলা বসাক জানিয়েছেন— "ব্রতী অর্থে কোন গুরুতর কার্যের দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বোঝায়। সংসারে বা পরিবারে নারীদের ভূমিকা বা দায়িত্ব অসীম। নারীদের ত্যাগ, আদর্শপরায়ণতা ও সেবাই সংসারকে সুখের করতে পারে। . . . . ব্রতকথা শোনার মধ্যে দিয়ে সংসারে কার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয় তার শিক্ষা লাভ হয় এবং কিভাবেই বা ত্যাগ, কর্তব্যপরায়ণতা ও স্নেহশীলতার দ্বারা আদর্শ নারী হওয়া যায় তারই প্রচ্ছন্ন আদেশ বা নির্দেশ দেওয়া হয়।"[২৮] আর বাংলার ব্রত অনুষ্ঠানে ব্রতীরা নানাবিধ আচার ও পূজা অনুষ্ঠানের শেষে যে কথা গল্পাকারে আবৃত্তি করে তাকে ব্রতকথা বলে। ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ' গ্রন্থে বলেছেন— "লৌকিক দেবদেবীর পুজো অনুষ্ঠানে ব্রত পালনের সময় লোককথাগুলি আবৃত্তি করা হয় বলেই একে ব্রত কথা বা ব্রত অনুষ্ঠান কথা বলে।"[২৯] পূর্বোক্ত অভিধানে বলা হয়েছে—যে দেবতার আরাধনাকল্পে ব্রত করা হয়, সেই-দেবতার মাহাত্ম্য-কাহিনীই ব্রতকথা।[৩০] এসমস্ত ব্রতানুষ্ঠান বা ব্রতকথার উদ্ভব মূলে রয়েছে গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান, আদিম টোটেম-টাবু, জাদুশক্তি বা জাদুবিদ্যার প্রতি আস্থা, প্রজনন শক্তির উপাসনা, লৌকিক সূর্যপূজা ইত্যাদি কৃষিজীবী সমাজের বাস্তব প্রয়োজন বোধ। এসমস্ত ব্রতকথা বাংলার বাইরে প্রচার লাভ করেছে তাই নয়, সমস্ত ব্রতকথা বা ব্রতাচারই যে বাংলার লোকসমাজের তা না-ও হতে পারে। অনেকের মতে ব্রতকথার মৌলিক প্রেরণা বাংলাদেশের বাইরের বিভিন্ন কৃষিজীবী আদিম সমাজও হতে পারে, কিন্তু তা বাংলার জল-বাতাসে পুষ্টিলাভ করেছে। তারপর আর তাদের উপর বিদেশীয় আবরণ থাকেনি, এদেশীয় আচার-বিচার আত্মীকরণের মধ্যে দিয়ে বাংলার লোক-সমাজের সম্পদে পরিণত হয়েছে।

ব্রতকথার দেবদেবীরা কিন্তু শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক দেবদেবী নয়, অনেক সময় তাদের পুরাণোক্ত দেবদেবী বলে ভ্রম হতে পারে; বিশেষত তাদের নামানুসারে। কিন্তু তারা অপৌরাণিক-লৌকিক দেবদেবী মাত্র; তাই এদের পূজা পদ্ধতি ও আচার স্বতন্ত্র; কোন পুরোহিতদর্পণে এদের পূজা পদ্ধতি লেখা হয়নি, পূজা অনুষ্ঠানের জন্য পুরোহিতেরও প্রয়োজন নেই।আসলে আর্য-অনার্য সমাজ সংমিশ্রণের ফলে নতুন সংহত সমাজ গড়ে ওঠার অবকাশ পেয়েছিল, সেখানে দেবচরিত্রগত সংমিশ্রণের ফলে তার ভিতরে একাধারে শুভঙ্করী শক্তি ও অন্যদিকে অনিষ্টকারী শক্তির প্রকাশ পেয়েছে। তাইতো পূজা-অর্চনা দ্বারা সন্তুষ্ট করতে পারলে ইষ্টলাভ, আর দেবী অসন্তুষ্ট হলেই অনিষ্ট। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— দেবী সন্তুষ্ট হলে গোলা ভরা ধান হয়, গোয়াল ভরা গরু হয়, হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া হবে, আর অসন্তুষ্ট হলে গোয়ালে গরু মরে, হাতিশালে হাতি মরে, ঘোড়াশালে ঘোড়া মরে।[৩১] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ব্রতীর কামনা-বাসনাও অত্যন্ত সাধারণ, ঐহ্যিক কামনা বাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ সাধারণত পারত্রিক কোন কামনা-বাসনা ব্রতকথার মধ্যে প্রকাশ পায় না।ব্রতের দেবীরাও মানুষের মত হাসে, কাঁদে, তারা লোভ-দ্বেষ-হিংসা নিয়ন্ত্রিত মানব জীবনসীমাকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। এখানে মানুষের সঙ্গে দেবতার পার্থক্যও প্রায় থাকে না। ডঃ ভট্টাচার্যের মতে— যেহেতু ব্রতকথাগুলি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যহীন সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত, তাই এখানে কোন ব্যক্তিত্বমণ্ডিত চরিত্র থাকতে পারে না, ফলে দেবতা এখানে মানব চরিত্রের দ্বারাই

প্রভাবিত, মানুষ দেব চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত নয়।[৩২] আসলে ভয় থেকেই ভক্তি আসে; একদা অরণ্যবাসী মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলি যথা—দাবানল, ঝড়, বজ্র,বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বন্যাকে ভয় পেত। কেননা তারা ছিল সকল প্রকার শিক্ষার সংস্পর্শ বর্জিত । ফলে বিপদসঙ্কুল পরিবেশ থেকে তাদের মনে নানা প্রকার সংস্কার, ভয়-ভীতি দানা বাঁধতে থাকে। মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদ থেকেই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নানা রকম অলৌকিক শক্তি কল্পনা করে এবং তাদের ভক্তি করে, পূজা-আচ্চা দ্বারা সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে— এ বিশ্বাস থেকে যে, তারা সন্তুষ্ট হলে আর অনিষ্ট করবে না। এ সূত্রকে অন্তঃস্থলে বহন করে স্মরণাতীত কাল থেকেই ব্রতাচার পালিত হয়ে আসছে। আজও তা হিন্দু বাঙালীর ঘরে ঘরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। এভাবে ক্রমশ বহু অপৌরাণিক ব্রতাচার ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে গেছে, ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে আদি ও মধ্যযুগে এসে। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে কোন লৌকিক ব্রতের উল্লেখ নাই। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে জানিয়েছেন- আর্যরা অনার্যদের 'অন্যব্রত' নামে ডাকত।[৩৩] আর্যদের চোখে অন্যব্রতরা ছিল হীন। ঠিক একইভাবে নীহাররঞ্জন রায় 'ব্রাত্য' শব্দটির উৎস সন্ধান করেছেন। তিনি অনুমান করেছেন 'ব্রাত্য' শব্দটি 'ব্রত' থেকে এসেছে। তিনি লিখেছেন— "যাত্রা, ধ্বজাপূজা প্রভৃতির মতো ব্রতোৎসবও বাঙালীর দৈনন্দিন ধর্মজীবনে একটি বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি জটিল ও সুপ্রাচীন, তবে এই ধরনের ধর্মোৎসব যে প্রাক্-বৈদিক আদিবাসী কোমদের সময় হইতেই সুপ্রচলিত ছিল এ সম্বন্ধে সংশয় বোধ হয় নাই। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যাঁহাদের বলিয়াছে 'ব্রাত্য' বা পতিত, তাঁহারা কি ব্রতধর্ম পালন করিতেন বলিয়াই ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন?"[৩৪] তিনি আরও জানিয়েছেন যে,- অবৈদিক-আর্যভাষীদের বৈদিক-আর্যভাষীরা 'ব্রাত্য' বলে চিহ্নিত করেছিল। ব্রাত্যরা তাদের কাছে পতিত, বিপথগামী, তাই 'ব্রাত্যস্তৌম' যজ্ঞ দ্বারা পরিশুদ্ধির মাধ্যমে ব্রাত্যদের সমাজে গ্রহণ করা হত।[৩৫] প্রাচীনকালে আর্য পুরুষরা যুদ্ধ জয়ের যাগ-যজ্ঞ করেছে, অনার্যরা যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন অন্তঃপুরচারিণী নারীরা ব্রত পালন করে স্বামী-পুত্রের সৌভাগ্য কামনা করেছে, বিজয় কামনা করেছে। ব্রতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন— "নানা ঋতুর মধ্যে দিয়ে নানা সব ঘটনা মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করেছে এবং এই-সকল ঘটনার মূলে দেবতা অপদেবতা নানারকম কল্পনা করে নিয়ে তারা শস্যকামনায়, সৌভাগ্য কামনায়— এমনি নানা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্রত করেছে কী আর্য কী অন্যব্রত সব দলেই, এইটেই হল ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস"[৩৬]। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে ব্রতগুলি প্রাক্‌বৈদিক যুগের সংস্কৃতিকে বহন করেই এসেছে।

ব্রতগুলি উদ্ভবকালের বহু উপাদান আপন অঙ্গে বহন করে চলেছে আজও তার প্রায় কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের মানসিক গঠন ও জীবনচর্যাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থেকে নিজের জীবনযাত্রাকে গড়ে তোলে এবং নিজের জীবনকে নিরাপদ করতে চায়, এই আত্মরক্ষার প্রবণতা থেকেই মানুষ অনিষ্টকারী শক্তিকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে এবং তার উপকরণ সংগ্রহ করেছে নিজ নিজ পরিবেশ থেকে, নিজ নিজ জীবনযাপনের সহকারী উপাদান থেকে। তাই ব্রতাচার, ব্রতের ছড়া-পাঁচালীর মধ্য চারিপাশের উপকরণগুলির ব্যবহারই দেখা যায়; শুধু তাই নয়, ব্রতের কামনা অনুযায়ী উপাদানগুলির রকমফের ঘটে যায়। আদিম মানব সমাজে প্রাকৃতিক শক্তিপূজা, বৃক্ষপূজা, নদীপূজা, বাস্তুপূজা ইত্যাদির আলাদা আলাদা উপাদান-উপকরণ আছে, তাছাড়া বিশেষ কামনায় অনুষ্ঠেয় ব্রতগুলিতে আলাদা আলাদা উপকরণ আছে।

তাই আমরা দেখি পূজা-পার্বণ বা ব্রতের বিবর্তন পথে প্রাকৃতিক শক্তিপূজা-বৃক্ষপূজা-পশুপূজা-প্রতীকপূজা-মূর্তিপূজায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে। আমরা দেখি লৌকিক দেবদেবীদের প্রত্যেকেরই পশুবাহন আছে, তাদের সিজবৃক্ষও আছে। ধারণা করা যায়— ঐ দেবদেবী নির্দিষ্ট পশু বা সিজবৃক্ষের প্রতীকে পূজিত হত। আমরা দেখি দেবদেবীদের বাহন হল পশু ও পাখি; যেমন- চণ্ডীর সিংহ, লক্ষ্মীর পেঁচা, সরস্বতীর হাঁস, কার্তিকের ময়ূর, গণেশের ইঁদুর, শিবের ষাঁড়, ইত্যাদি। আবার শিবের বেলগাছ, কৃষ্ণের তুলসী ও কদমগাছ, মনসার মনসাসিজ বা ফণীমনসা গাছ, লক্ষ্মীর কলাগাছ, শীতলার নিমগাছ এছাড়াও বিভিন্ন দেবদেবীর বকুল, অশ্বত্থ, বট, বাঁশ, মানকচু, পলাশ, আম, ডুমুর, শেওড়া, আমলকি ইত্যাদি দেবতার প্রতীকে পূজা করা হয়। ব্রতানুষ্ঠান বা পূজায় ঐ সমস্ত বৃক্ষপত্র বা ফল আবশ্যক হয়। যেমন শিবের ত্রিপত্র- বেলপাতা, কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর পূজায় তুলসী পাতা, লক্ষ্মী পূজায় কলাগাছ, সরস্বতী পূজায় পলাশফুল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাছাড়াও পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চকষায়, পঞ্চশস্য আবশ্যক হয়। ব্রতাচারের এসমস্ত বহু উপাদানই অনার্য সংস্কার জাত, যেমন- ধান, যব, তিল, সরিষা, কলাই, নারকেল, পান, সুপারি, আম্রপল্লব, কলা পাতার অগ্রভাগ (আগ্নিপাতা), মঙ্গলঘট, সিঁদুর, আখ, কুশ, হলুদ, দূর্বা, বিভিন্ন ধরনের পত্রপল্লব ইত্যাদি। পশুপালক সমাজের স্মৃতি বহন করে গৃহপালিত পশুজাত দ্রব্য, যথা— পঞ্চগব্য অর্থাৎ গোবর, গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই ব্রতাচারগুলিতে বিভিন্ন প্রতীক আলপনা অঙ্কন করা হয়, তাতে কামনা-বাসনার পরিস্ফুরণ লক্ষ করা যায়। কখনো উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি কামনায়, কখনো প্রজনন শক্তি বৃদ্ধির কামনায়, কখনো বা জাদুশক্তি কামনায় ঐসব ব্রতগুলি পালিত হয়। এর মধ্যে বহু যুগের বহু মানুষের কামনার প্রকাশ আছে; আবাল বৃদ্ধ-বনিতা, সমাজের প্রতিটি মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের অশ্রুসজল কাহিনী আছে। সেখানে আর্য আর অনার্যদের বিচিত্র আদান-প্রদানের ইতিহাস, পৌরাণিক-অপৌরাণিক সকল দেবদেবীর উদ্ভবের ইতিহাস, এই বিচিত্র ভাবের আদান-প্রদানের ইতিহাস, শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় সকল প্রকার ব্রতের ইতিহাস ঐ একই ভূমিতে উপ্ত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন— "পুরাণের দেবদেবীদের উৎপত্তির ইতিহাস এই আদানপ্রদানের ইতিহাস;ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইতিহাসও তাই, কেবল এই মেয়েলি ব্রতগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা সেই-সব দিনের মধ্যে গিয়ে পড়ি যেখানে আমাদের পূর্বতন-পুরুষ অন্যব্রতরা তাঁদের ঘরের মধ্যে রয়েছেন দেখি। সব-উপরে হিন্দু-অনুষ্ঠানের অনেকটা গঙ্গামৃত্তিকা, গৈরিক—এমনি সব নানা মাটির একটা খুব মোটা রকমের স্তর; তার পর বৈদিক আমলের মূল্যবান ধাতুস্তর; তারও তলায় অন্যব্রতদের এই-সব ব্রত— একেবারে মাটির বুকের মধ্যেকার গোপন-ভাণ্ডারে।"[৩৭]

শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি বাদে মেয়েলি ব্রতগুলি দু'প্রকার— নারীব্রত ও কুমারীব্রত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন নারীব্রতগুলির সঙ্গে অনেকখানি শাস্ত্রীয় ব্রতাচার মিশে আছে, কুমারী ব্রতগুলি অনেকখানি বেশি খাঁটি। ব্রতাচারগুলি কুমারী মেয়েদের কামনা-বাসনার প্রতীক, তবে যেমন কামনা তেমনি তার ব্রতাচার। এখানে পুরোহিতের প্রয়োজন নেই, নারীরাই ব্রতী, নারীই আয়োজক ও পুরোহিত। গ্রাম্য মেয়েরা ভবিষ্যত জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি কামনায় মুখরিত করে রাখে। বারোমাসে তেরো পার্বণের বাঙালী সমাজে এসব ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ সমাজ মুখরিত হয়ে থাকত। অন্তঃপুরচারিণী নারীর গোপন আশা-আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে রূপলাভ করত। কখনো স্বামী পুত্রের মঙ্গল কামনা, কখনো সতীত্ব রক্ষা, কখনো বা সন্তান কামনা এবং সুখ-সম্পদ কামনা করে ব্রতগুলি পালিত হত। এর মধ্যে সমকালীন সমাজ সত্য, ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে থাকে, নারীর পার্থিব কামনা-বাসনার মধ্যে তা প্রকাশ পায়। বহুবিবাহের জ্বালা, সপত্নী কলহ থেকে রেহাই পাওয়া, পুত্রবতী হওয়া, ভালো রাঁধুনী হওয়া, সহনশীলা হওয়ার কামনা থাকে; যার মধ্যে সেকালের নারীর অবস্থান ও তাদের করুণ কাহিনী রূপলাভ করে থাকে। যেমন 'দশপুতুল' ব্রতের মন্ত্রে নারীর চিরায়ত কামনা রূপলাভ করেছে। যেমন—

১। এবার ম'লে মানুষ হব, সীতার মত সতী হব।

২। এবার ম'লে মানুষ হব, রামের মত পতি পাব॥
৩। এবার ম'লে মানুষ হব, লক্ষ্মণের মত দেবর পাব।
৪। এবার ম'লে মানুষ হব, দশরথের মত শ্বশুর পাব॥
৫। এবার ম'লে মানুষ হব, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব।
৬। এবার ম'লে মানুষ হব, কর্ণের মত পুত্র পাব॥
৭। এবার ম'লে মানুষ হব, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব।
৮। এবার ম'লে মানুষ হব, দুর্গার মত সোহাগী হব।
৯। এবার ম'লে মানুষ হব, দূর্বার মত নত হব।
১০। এবার ম'লে মানুষ হব, ধরার মত ধৈর্য ধরব॥

সমাজ জীবনের বহু করুণ বাস্তব চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায় উচ্চারিত মন্ত্রে। যেমন সেঁজুতি ব্রতের 'অশ্বত্থ গাছ' মন্ত্র—"অশ্বত্থ তলায় বাস করি। সতীনের ঝড় বিনাশ করি॥ সাত সতীনের সাত কৌটা। তার মাঝে আমার এক অস্ত্রের কৌটা॥ অস্ত্রের কৌটা নাড়ি চারি। সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি॥"

কন্যা সন্তানের জন্মদানের পরিণতি আমাদের সমাজের জানা; নারীর তাই কামনা পুত্রসন্তান, কন্যাসন্তান নয়, তাই 'অশ্বত্থপাতা' ব্রতের মন্ত্র—

"ঝুরঝুরোটি মাথায় দিলে, চুনি-মুক্তোর ঝুরি হয়।
কচিটি মাথায় দিলে, কমল পুত্র কোলে হয়।"

ব্রতাচারগুলির মূল লক্ষ্যই হল দেবদেবীর গুণকীর্তনের মধ্যে দিয়ে কামনা-বাসনার পূরণ আকাঙ্ক্ষা করা। নারী সমাজ শুধুমাত্র আপন সুখ-সমৃদ্ধিই কামনা করে না, করে সকলের মঙ্গল কামনা। তাই বৈশাখ মাসে যখন নদ-নদী, খাল-বিল, শুকিয়ে যায় তখন ধরিত্রীর উর্বরতা কামনায়, বৃষ্টি কামনায় বসুধারা ব্রত বা পৃথিবী ব্রত পালন করে। পুকুর খননের ইচ্ছায় 'পুণ্যিপুকুর' ব্রত, শস্য কামনায় অগ্রহায়ণ মাসে 'ইতুপূজা ব্রত' পালিত হয়। অরণ্যষষ্ঠী ব্রতেও সকলের মঙ্গল কামনা করা হয়—

"জ্যৈষ্ঠমাসে অরণ্য ষাট। ফিরে ঘুরে এল ষাট॥
বার মাসে তের ষাট। ষাট ষাট ষাট॥
ঝি-চাকরের ষাট। গোরু-বাছুরের ষাট॥
কর্তার ষাট, ছেলেমেয়ের ষাট।
বউ ঝিয়ে ষাট, নাতি-নাতনীর ষাট। ষাট ষাট ষাট॥"[৩৮]

সকল ব্রতেই এই জাতীয় মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় নারীর চিরন্তন কামনার প্রতিফলন দেখি। আমাদের সাহিত্যে বাংলার বিভিন্ন ব্রতাচারের বিবরণ পাওয়া যায়। বাঙালী রমণীগণ নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে ব্রত পালন করে থাকে। কেননা ব্রত পালনের ফলে মঙ্গল হয়, আর ব্রত পালনের ত্রুটি হলে অমঙ্গল হয়। মঙ্গল-অমঙ্গলের আশঙ্কায় নারীগণ আপন অন্তঃপুরে থেকেই দেবীর কাছে প্রার্থনা জানায়, কল্যাণ কামনা করে।

তাছাড়াও ব্রত পালনের অন্য ফলও আছে। উপবাস করলে শরীর সুস্থ থাকে. ফলমূলাদি ভক্ষণে নারীর পুষ্টিলাভ ঘটে, বিশ্রাম লাভ ঘটে, ধৈর্য ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ক্ষমতা জন্মায় । ব্রতের পালনীয় বিভিন্ন আচারের বৈজ্ঞানিক কারণও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যেমন মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পালন করলে টক্ না খাওয়া, সরস্বতী পূজার আগে কুল না খাওয়া, নবান্ন উৎসবের আগে নতুন চাল না খাওয়া ইত্যাদিতে সংস্কারের পাশাপাশি আবেগ ও সংস্কৃতির পরিচয় থাকে। এর মধ্যে থেকে সমাজ জীবনে বিভিন্ন শিক্ষা, ভবিষ্যৎ জীবন পদ্ধতির পাঠগ্রহণ সম্ভব।

এসব ব্রত পালনের বিভিন্ন স্তর আছে। যেমন, কিছু ব্রত মাসিক ব্রত হিসাবে পালিত হয়, আবার কতককগুলি বারোমেসে ব্রত। ঋতুবৈচিত্র্যময় বাংলাদেশে ঠিক ঠিক ঋতুধর্ম অনুযায়ী ব্রত পালিত হয় এবং তার

উপকরণ ব্যবহৃত হয়। যেমন জামাইষষ্ঠীর ব্রতের অন্যতম উপকরণ আম, তালনবমী ব্রতের উপকরণ তাল। আবার এগুলি অন্যান্য ব্রতে নিষ্প্রয়োজন। যেমন বিভিন্ন সময়ে পালিত মাসিক ব্রতগুলি হল— বৈশাখ মাসে পুণ্যিপুকুর ব্রত, অশ্বত্থপাতা ব্রত, শিবঠাকুরের ব্রত, গো-কল ব্রত, পৃথিবী ব্রত, হরিরচরণ ব্রত, দশপুতুল ব্রত, নিত্ সিন্দুর ব্রত, অক্ষয়ফল ব্রত, অক্ষয়ঘট ব্রত, মধু সংক্রান্তি ব্রত, ছাতু সংক্রান্তি ব্রত, ঘৃত সংক্রান্তি ব্রত, বৈশাখী পূর্ণিমা ব্রত, অক্ষয়কুমারী ব্রত, হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত, বৈশাখ চম্পক ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসে মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, জামাইষষ্ঠী বা অরণ্যষষ্ঠী ব্রত, চাঁপাচন্দন ব্রত, জ্যৈষ্ঠচাঁপা ব্রত। আষাঢ় মাসে বিপত্তারিণী ব্রত।শ্রাবণ মাসে নাগপঞ্চমী ব্রত, লোটনষষ্ঠী ব্রত। ভাদ্র মাসে মন্থনষষ্ঠী ব্রত, দূর্বাষ্টমী ব্রত, তালনবমী ব্রত, অনন্তচর্তুদশী ব্রত। আশ্বিন মাসে দুর্গাষষ্ঠী ব্রত।কার্ত্তিক মাসে বৈকুণ্ঠচর্তুদশী ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসে ইতুপূজা ব্রত, সেঁজুতি ব্রত, নাটাইচণ্ডী ব্রত। পৌষ মাসে লক্ষ্মীপূজা ব্রত। মাঘ মাসে ভৈমীএকাদশী ব্রত। ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি ব্রত। চৈত্র মাসে অশোকষষ্ঠী ব্রত, রামনবমী ব্রত ইত্যাদি। এছাড়াও বারোমেসে ব্রত, যেমন সুবচনী ব্রত, সত্যনারায়ণ ব্রত; সাপ্তাহিক ব্রত হিসাবে পালিত হয় শনির ব্রত। প্রতি সপ্তাহের শনিবার এই ব্রত পালিত হয়। এই ব্রতাচারের বিভিন্নতা ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন কামনা— জাদুশক্তির কামনায় বৃক্ষবিবাহ, পশুবিবাহ ইত্যাদিও বিভিন্ন ব্রতাচারের অঙ্গীভূত হতে দেখা যায়, যা আদিম সমাজব্যবস্থার সাক্ষ্য বহন করে। বট ও অশ্বত্থ গাছকে বর-কনে হিসাবে ধরে বৃক্ষ বিবাহ, কোথাও বা কলাগাছ বিবাহ, কোথাও বা ব্যাঙের বিবাহ (বৃষ্টি কামনায়); সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশুর সঙ্গে মানুষের বিবাহও হতে দেখা যায়। অমানবিক প্রথা হলেও আজও তা সম্পূর্ণরূপে সমাজ থেকে মুছে যায়নি।

লৌকিক ব্রত হলেও এই ব্রতগুলির উপর ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের ছাপ পড়ে গেছে, বহু ব্রতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়। কতকগুলি ব্রতে মূল্যবান সামগ্রী ব্রাহ্মণ পুরোহিত পেয়ে থাকে। এই ব্রতগুলি উচ্চবর্ণের সমাজে গ্রহণের পাশাপাশি ব্রাহ্মণের লোলুপতার ছাপ সুস্পষ্ট। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল ব্রত সৃষ্টির মূলে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণদের আর্থিক দুর্গতিকে চিহ্নিত করেছেন, তিনি মনে করেন আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পেই লোভী ব্রাহ্মণরা বিভিন্ন ব্রতে নানা রকম দ্রব্য দানের বিধান দেয়।[৩৮] যেমন অক্ষয়ঘট ব্রতের শেষ বছর চারজন ব্রাহ্মণকে পিতলের কলসী, পিতলের সরা, পাখা ইত্যাদি দিতে হয়, কিংবা মধুসংক্রান্তি ব্রতে বারোটি মধু পূর্ণ কাঁসার বাটি, একটি মধু পূর্ণ রূপার বাটি দিতে হয়, সুতরাং সাধারণ দরিদ্র ঘরের মেয়েদের পক্ষে এসব ব্রত পালন করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। বস্তুতপক্ষে এসব ব্রতগুলিও পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের মধ্যে পড়ে জটিল হয়ে ওঠে এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজ আপন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের পলি পড়লেও দেখা যায় অনেক দেবদেবীর ক্ষেত্রে এই সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে অর্ধেক বা কোন ক্ষেত্রে সামান্য সংস্কার হয়েছে মাত্র. যেমন শনিদেব; শনিদেব গৃহের মধ্যে এলেও তার পূজা হয় আঙ্গিনায়, গৃহাভ্যন্তরে নয়। শনিদেব অস্পৃশ্য দেবতা হওয়ায় তার প্রসাদও ঘরে তোলা হয় না। তেমনি অনেক দেবতা আজও অরণ্যে, ক্ষেত্রে বা বৃক্ষতলেই থেকে গেছে। ব্রতকথাগুলি কিন্তু নারী মহলেরই সম্পদ, পুরুষের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই বলা চলে। কেননা পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান অন্তঃপুর; অন্তঃপুরের চার দেওয়ালে আবদ্ধ নারী দেবতার কাছেই তাদের একান্ত কামনা-বাসনা নিবেদন করে এসেছে। ধরা যেতেও পারে, পুরুষশাসিত সমাজেই নারীব্রতের সৃষ্টি হয়েছিল। যত দিন না সামাজিক প্রয়োজনে মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি হয়েছে ততদিন পুরুষ সমাজ এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি। ব্রতের দেবীরাই সমাজ ইতিহাসের প্রয়োজনে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে. তারা মঙ্গলকাব্যের দেবীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ব্রতের দেবী মঙ্গলকাব্যের দেবীতে পরিণত হলেও ব্রতের দেবীর মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়নি। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— "ব্রতকথার দেবতাদিগের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের ভাবগত সম্পর্ক আছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রতকথা ভিত্তি করিয়াই উচ্চতর সাহিত্য মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্রতকথার একটি স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র আছে বলিয়াই মঙ্গলকাব্য ইহার ধারাটি লুপ্ত করিয়া দিতে পারে

নাই।"[৪০] ব্রতকথাগুলি থেকে মঙ্গলকাব্যগুলি সৃষ্টি হলেও ব্রতকথাগুলি কেন কোন রকম পরিবর্তন ও পরিমার্জনা ছাড়াই অটুট থেকে গেছে, তার কারণগুলি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ ব্রতকথাগুলি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যহীন সমাজ থেকে সৃষ্টি বলে আজও অপরিবর্তিত থেকে গেছে। অপরদিকে মঙ্গলকাব্যগুলি অনেক পরিশীলিত সৃষ্টি বলে কালগত চেতনা পরিবর্তনের ফলে তার গঠনগত, রূপগত, স্বভাবগত নানান পরিবর্তন ঘটে গেছে। বস্তুত মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং অন্নদামঙ্গল মঙ্গলকাব্য হলেও এক নয়, কারণ কবির চেতনাগত পরিবর্তন। আবার একই মঙ্গলকাব্য বিভিন্ন সময়ের সৃষ্টি বলে একই দেবীমঙ্গল কাব্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে অর্থাৎ নতুন মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নতুন নতুন ব্রতকথা তৈরী হয়নি। অবশ্য পরবর্তীকালে পুরুষ দেবতা-কেন্দ্রিক শনি বা ত্রিনাথের ব্রতকথা এবং স্ত্রীদেবতাকে কেন্দ্র করে সন্তোষী মাতার ব্রতকথা তৈরী হয়েছে। সমাজের বিভিন্নরকম প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র থেকে।

দ্বিতীয়তঃ ব্রতকথাগুলি সম্পূর্ণভাবে সমাজের সৃষ্টি। নির্দিষ্ট সমাজ থেকে ব্রতকথার উৎপত্তি ও ব্রতের বিধি তৈরী হয়েছিল, তা কালক্রমে বাহিত হয়ে এসেছে অপরিবর্তিত ভাবে। অপরদিকে মঙ্গলকাব্যগুলি পরিশীলিত সৃষ্টি, সেখানে আছে সচেতন কবি-ব্যক্তিত্বের ছাপ, ফলে কবি ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী মঙ্গলকাব্য পরিবর্তিত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ ব্রতকথাগুলি ধর্মাচরণের অঙ্গ, একারণে বহুল প্রচার সত্ত্বেও দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত থেকে গেছে। মঙ্গলকাব্যগুলি কিন্তু ধর্মাচরণের অঙ্গ নয়। কোন দেবতার পূজা উপলক্ষে ঐ দেবতার মঙ্গলগান গীত হতে পারে, তবে এবিষয়ে বাধ্যবাধকতা কিছু নেই। তাছাড়াও বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি বা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মঙ্গলগান গীত হতে পারে। কিন্তু ব্রতকথাগুলি নির্দিষ্ট ব্রতাচারের অঙ্গ হওয়ায় ব্রতকথাগুলি আবৃত্তি না করলে ব্রত সম্পূর্ণ হয় না, এমনকি ব্রতের শেষে ব্রতকথা শ্রবণ না করলে ব্রতের সম্পূর্ণ ফললাভ সম্ভব নয়, তাই নতুন ব্রতকথা সৃষ্টি হয়নি।

চতুর্থতঃ ব্রতকথাগুলি একান্তভাবে নারী সমাজের বিষয় হওয়ায় তা সহজে বদলে যায়নি। কেননা আমাদের অন্তঃপুরটা সহজে বদলায় না, এ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য— "এই সব অতি পুরাতন ব্রত এখনও কেমন ক'রে বাঙালির ঘরে ঘরে করা হয়, এর উত্তরে বলা চলে আমাদের সদর অংশটা যতটা বদলে গেছে, আমাদের অন্তঃপুরটা তার সঙ্গে তো বদলে যায়নি। সেটা কাল, তার পূর্বে এবং তার—তার—তারও পূর্বে যা আজও তা। অন্তত বেশির ভাগ মেয়েলি কাণ্ডই এইরূপ। সেখানে ঠাকুরমার সঙ্গে নাতনির এবং ঠাকুরমাতে ও তাঁর ঠাকুরমাতে খুব তফাত নেই।"[৪১]

ব্রতকথাগুলি অটুট থেকেই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন— ব্রতকথাগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হওয়ায় বিষয়বস্তুর দিক থেকে কোন রকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়নি অর্থাৎ ব্রতকথাগুলি প্রাচীন এবং রক্ষণশীল ধারাকে অনুসরণ করে এসেছে। ব্রতের কাহিনী পল্লবিত হয়ে মঙ্গলকাব্যে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলকাব্য ব্রতকথা থেকেই এসেছে, ব্রতকথা মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা গ্রহণ করেনি।[৪২]

ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের সম্পর্কের দিকটিকেও লক্ষ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ ব্রতকথাগুলি মৌখিক সাহিত্যের অঙ্গ আর মঙ্গলকাব্যগুলি লিখিত সাহিত্যের অন্তর্গত। মৌখিক সাহিত্য কালে কালে মুখে মুখে প্রচারিত। দিদিমা থেকে নাতনী পর্যন্ত একই আকারে আবৃত্তি হয়ে এসেছে; এর হোতা কে তা জানা যায় না। অপরদিকে মঙ্গলকাব্যগুলি লিখিত হওয়ায় এতে শিক্ষিত কবি-ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। প্রতিটি দেশের সাহিত্যেই মৌখিক সাহিত্যকে ভিত্তি করেই লিখিত সাহিত্য গড়ে ওঠে, সুতরাং মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা ব্রতকথা প্রাচীনতর।

দ্বিতীয়তঃ ব্রতকথাগুলি গল্পাকারে গদ্য ভাষায় বিবৃত হয়, ফলে তাতে সংক্ষিপ্ততা থাকে, অবশ্য ব্রতকথা ছন্দোবদ্ধ ভাষায় লিখিত হলে পাঁচালীতে পরিণত হয়। মঙ্গলকাব্যগুলি প্রথমাবধি আগাগোড়া ছন্দোবদ্ধ রচনা, ফলে তাতে বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা থাকে।

তৃতীয়তঃ ব্রতকথার স্রষ্টা এবং পোষ্টা উভয়ই নারী। ব্রতের স্থান নারী মহলে আর মঙ্গলকাব্যের স্রষ্টা পুরুষশাসিত

সেহি দোসে ছাড়ি তোরে জায় লক্ষিন্দর॥" (নারায়ণ/৭৫)

শুধুমাত্র ব্রত মাহাত্ম্যই নয়, সমগ্র মঙ্গলকাব্য জুড়ে এরকম অজস্র ব্রতের পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগে রচিত অন্যান্য সাহিত্য শাখাতেও নানা ব্রতের উল্লেখ আছে। আমরা মধ্যযুগীয় কাব্য ধারানুযায়ী ব্রতের তালিকা উল্লেখ করতে পারি। যেমন- মনসা ব্রত, চণ্ডীব্রত, দশহরা ব্রত, অরফা বা অরন্ধন ব্রত, ষষ্ঠী ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত, লক্ষ্মী ব্রত, সূর্য ব্রত, একাদশী ব্রত, নারায়ণ ব্রত, অষ্টমী ব্রত, অসিপত্র ব্রত, চান্দ্রায়ণ ব্রত, অম্বুবাচী ব্রত, ধর্ম ব্রত, অনন্ত ব্রত, অমাবস্যা ব্রত, সত্যপীর ব্রত, কার্তিক ব্রত ইত্যাদি নানান ব্রতের মাহাত্ম্যের কথা উল্লেখ আছে। তাছাড়াও নাম না জানা বহু ব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মহাভারত, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন, কৃষ্ণরাম দাসের রচিত ষষ্ঠীমঙ্গল, কমলামঙ্গল বা লক্ষ্মীমঙ্গল কাব্যে, মৈমনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকাতে প্রচুর বিভিন্ন ব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন ব্রতকথার কাহিনীই যে ধীরে ধীরে মঙ্গলকাব্যে পরিণত হয়েছে সে বিষয়ে সমালোচক পণ্ডিতগণ সকলেই একমত।ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, তুর্কী আক্রমণের বহু পূর্বেই মনসা-চণ্ডীর মত বিভিন্ন ব্রতের দেবদেবীর লীলাকাহিনী প্রচলিত ছিল ব্রতকথার আকারে। তারপর একদা সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠালাভ ঘটলে পুরুষ সমাজেও ব্রতকথা পাঁচালীর আকারে পঠিত বা গীত হত।[৪৪] এভাবে ধীরে ধীরে ব্রতকথাগুলি পুরুষ সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় এবং পরবর্তীকালে বৃহত্তর সমাজ ব্রতকথা ও পাঁচালীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মঙ্গলকাব্যে পরিণত হয়। তাই ব্রতের কাহিনী অপেক্ষা পাঁচালীর কাহিনীগত পার্থক্য হয়ে যায় এবং সেখানে মঙ্গলকাব্যগুলি আরও পল্লবিত হয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, মঙ্গলকাব্যের চরিত্র পরিকল্পনাও ব্রতের চরিত্র পরিকল্পনা জাত। ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের সম্পর্ক অর্থাৎ ব্রতকথা থেকে মঙ্গলকাব্য কিংবা ব্রতের দেবী কিভাবে মঙ্গলকাব্যে পরিণত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন- "অন্তঃপুরাশ্রিতা অসহায়া নারী দৈব করুণার উপর সর্বোতভাবে আত্মনির্ভর করিয়া যেমন নিজের অবস্থার মধ্যে শান্তি ও সান্ত্বনার সন্ধান পাইয়া থাকে, একদিন তুর্কী আক্রান্ত বাংলার হিন্দু সমাজও অন্তঃপুর-বন্দিনী নারীর মতই তেমনই অসহায় বোধ করিয়াছিল। আত্মশক্তিতে মানুষ যখন বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে তখন সে স্বভাবতঃই দৈব-শক্তির উপর নির্ভর করে । যে অসহায় অবস্থার ভিতর দিয়া নারী দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ব্রতকথাগুলির জন্মদান করিয়াছে, সেই অবস্থার ভিতর দিয়াই পুরুষকেও মঙ্গলকাব্যের দেবত্ববোধ জাগ্রত করিতে হইয়াছিল বলিয়া উভয়ের পরিকল্পিত দেবচরিত্রের মধ্যে ঐক্য প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ'কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর উপর মেয়েলী ব্রতকথাগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাবও কিছু কিছু কার্যকর হইয়াছে।"[৪৫] বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন- "দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক অনেক ছড়া ও ব্রতকথা পাঁচ ছয় শতাব্দী পূর্ব হইতেই লোকের মুখে মুখে গীত হইয়া আসিতেছে। এইগুলিরই অপেক্ষাকৃত সুগঠিত রূপকে পাঁচালী বলা হয়। ক্ষমতাবান কবিদের হাতে পড়িয়া এই পাঁচালীই মঙ্গলকাব্যে পরিণতি লাভকরিয়াছে।"[৪৬] ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে — "বহু রূপকথা ও উপকথা পরবর্তীকালে ব্রতকথায় রূপান্তরিত হয়েছে। ব্রতকথাকে ভিত্তি করেই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে।"[৪৭] উপরিউক্ত মন্তব্যসকল থেকে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ব্রতকথা থেকেই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি। প্রথমে ব্রতকথা পাঁচালী কাব্যে এবং পরে পাঁচালী আরও সুগঠিত রূপ পেয়ে মঙ্গলকাব্যে পরিণত হয়েছে; ব্রতকথা-পাঁচালী-মঙ্গলকাব্য রূপে বিবর্তিত হয়েছে। অনেক পরবর্তীকালে পুরুষ দেবতাকে কেন্দ্র করে সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী এবং ত্রিনাথের পাঁচালী রচিত হয়েছে. আবার পুরুষ পুরোহিতের দ্বারাও অনেক সময় মেয়েলি ব্রতকথা পদ্যরূপ লাভ করেছে। ব্রতকথার লিখিত রূপই পাঁচালী হিসাবে কথিত হলেও ধীরে ধীরে পাঁচালী একটি বিশিষ্ট পরিভাষায় পরিণত হয়েছে।ব্রতের দেবতা সাধারণত স্ত্রী, মঙ্গলকাব্যের দেবতা স্ত্রী হলেও পুরুষ দেবতাও আছে, কিন্তু সত্যনারায়ণ, শনি কিংবা ত্রিনাথ পুরুষ দেবতা। ব্রতকথা সাধারণত ব্রতানুষ্ঠানে গল্পাকারে বলা হত, কিন্তু পুরুষ দেবতাদের ব্রতকথা গল্পাকারে বলার নিদর্শন

মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্রতের দেবী হিসাবে মনসার কোন প্রতিপত্তি নেই, অন্তঃপুরচারিণী মহিলার মত সেও খানিকটা অসহায়, তাই তার দৈবীসত্তার প্রকাশ হিসাবে অলৌকিক ক্ষমতা আরোপিত হয়েছে। ব্রতকথার চরিত্রগুলিই মনসামঙ্গলে খানিকটা ব্যক্তি পরিচয়ে চিহ্নিত। ব্রতের কাহিনীতে কোন বৃহত্তর সম্ভাবনা ছিল না, কাজেই ক্ষুদ্র গণ্ডীকে কাটিয়ে মঙ্গলকাব্যে পরিণত হওয়ার পাশাপাশি এখানে যুক্ত হয়েছে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিকাঠামো। ব্রতকথার গল্পাকারে প্রচলিত কাহিনী গেয় কাব্যে পরিণত হয়েছে।

মনসামঙ্গলের আদি কবি হিসাবে চিহ্নিত কানা হরি দত্ত। বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যে হরি দত্তের উল্লেখ করেছেন এবং হরি দত্তের কাব্যের নানা ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলেছেন এবং বলেছেন হরি দত্তের গীত মনসার পছন্দ হয়নি। মনসা স্বপ্নে কবিকে নির্দেশ দিয়েছিল—

"সর্ব্ব লোকে গীত গাহে না বোজে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত॥
হরিদত্তের গীত লোপ্ত পাইল এই কালে।
জোড়া গাথা নাহি কিছু ভাণ্ডে বোলে চালে॥
গীতে মতি না দেয়ে কেহ ভাবে বোলে চাল।
তাহা দেখি পুত্র মোর উপজে বিশাল॥
মোর বোলে পুত্র তোমি হও সাবহিত।
নানা ছন্দে নানা রাগে রচ মোর গীত॥" (বিজয়/৫)

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কানা হরি দত্ত সম্পর্কে বলেছেন— "তিনি সম্ভবতঃ মনসামঙ্গলের ছড়ার রূপকে পাঁচালীর আকার দিয়াছিলেন।"[৩০] পঞ্চদশ শতকে বিজয় গুপ্তের সুগঠিত মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হলে হরি দত্তের পাঁচালী ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। ক্ষেমানন্দের ভণিতাযুক্ত মনসামঙ্গলের ক্ষুদ্র রচনা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে বলে জানিয়েছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।[৩১] এই রচনাটি ব্রতকথার পাঁচালীর মত। সুতরাং মনসামঙ্গল কাব্য ব্রতকথা ও পাঁচালীর মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছে। যদিও নাগপঞ্চমী ব্রতকথার সঙ্গে মনসামঙ্গলের কাহিনীর কোন মিল নেই, তবে মনসামঙ্গলের মতই কনিষ্ঠা বধূর অসাধ্যসাধনের কাহিনী আছে, মনসার দাক্ষিণ্যে যশ ও খ্যাতির কথা আছে। মনসামঙ্গলের কাহিনীও কনিষ্ঠা বধূর অসাধ্য সাধনের কাহিনী— জাদুশক্তি এবং মৃতের পুনর্জীবন লাভের কাহিনী, প্রাণের উর্বরতার কাহিনী, হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়া, সন্তান লাভ, বন্ধ্যাত্ব মোচন ও অন্ধত্ব মোচনের কাহিনী। বিভিন্ন কবির রচিত মনসামঙ্গলে ব্রতের প্রসঙ্গটি আছে যা চাঁদ সদাগরের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়েছে। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-এ মনসাপূজা ও মনসার ব্রত সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"এইত আষাঢ় মাসে জগত হরষিত।
চৌদিগে মনসা পূজে গাইনে গাহে গীত॥
পাতিয়া বিচিত্র ঘট সমুখে গীত গায়ে।
কোন অপরাধে ঘট ঠেলে বাম পায়ে॥
চান্দো সদাগর বেটা চম্পকিয়া রাজা।
চম্পক নগরে বেটা মানা করে পূজা॥
এইত শ্রাবণ মাসে মনসা পঞ্চমী।
লুকাইয়া সনকা পূজে তথা গেলাম আমি॥" (ঐ / ৪৯৮)

ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে অনুরূপ প্রসঙ্গের সাক্ষাৎ পাই। শিবঠাকুর মনসাকে বর দিতে গিয়ে বলেছে—

"সদয় হইয়া আমি তোরে দিল বর।
করিব তোমার পূজা দেব সুর নর॥
বার পর্ব্ব তোমার হইব বার মাসে।
জ্যৈষ্ঠে জগতী পূজা-দশমী দিবসে॥
আষাঢ়ে হইব নাগ পঞ্চমীর পূজা।
ঝাপান করিব যত ঝাপানিয়া ওঝা॥
শ্রাবণ মাসেতে পূজা লবে খরতরা।
খই দধি দিয়া লোক পালিবেক ঢেরা॥
ভাদ্রমাসে ভালমতে পূজিবেক নরে।
হইবে আরব্ধ ব্রত প্রতি ঘরে ঘরে॥
পান্ত ওদন দিয়া পূজিবেক তোমা।
আশ্বিনে অকথ্য পূজা দিতে নাঞি সীমা॥
কার্ত্তিক মাসের পূজা কহনে না যায়।
কুহু তিথি সুহু বৃক্ষে পূজিবেক তোমায়॥
আখণ্ড সিজের ডাল করিয়া রোপণ।
আতব তণ্ডুল রম্ভা নানা আয়োজন॥
করিব তোমার পূজা দেবাসুরগণে।
নৌতন সকল দ্রব্য হইব আঘনে॥
পৌষে পরমেশ্বরী পবিত্র আচারি।
মাঘমাসে মহাপূজা লইবে কুমারী॥
ফাল্গুন চৈত্র মাসে চৌদ্দ ভুবনে।
করিব তোমার পূজা দেবাসুরগণে॥" (ক্ষেমানন্দ/২৬)

এখানে মনসার ব্রত বারোমেসে ব্রত হিসাবে উল্লিখিত। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলাকে মনসার দাসী অর্থাৎ ব্রতদাসী হিসাবে উল্লেখ করতে দেখা যায়। বিজয় গুপ্তের কাব্যে আছে—

"যদি হই শুদ্ধমতি রক্ষা করবে পদ্মাবতী
তোমার গাইলে কি হইব আমা।
চিত্ত দিয়া শোন বসি আমি মনসার দাসী
যতি দেখি খেমিলাম তোমা॥" (বিজয়/৩২৭)

ক্ষেমানন্দের কাব্যেও মনসা জালু-মালুর জননীকে ব্রতদাসী বলে উল্লেখ করেছে এবং বলেছে, মনসা আগে তার পূজা নিতে যাচ্ছে—

"মনসা বলেন নেত শুন মোর বাণী।
করিব আমার পূজা জালুর জননী।
চাম্পাই নগরে আছে জালুমালুর মা।
রাত্রিদিন জপে মনে মনসার পা॥
পদুমার পরিচর্য্যা করে দিবানিশি।
জালুর জননী বটে মোর ব্রতদাসী॥

.. ..

আমার মঙ্গল পূজা আছে ব্রতগাথা।

জালুমালুর পূজা নিতে আগে যাব তথা॥" (ক্ষেমানন্দ/১৩৬)

বেহুলাও নিজেকে মনসার ব্রতদাসী বলে উল্লেখ করেছে—

"বেহুলা বলেন মাতা জয় বিষহরি।

আমি তব ব্রতদাসী সাধুর কুমারী॥"(ঐ/২৮৯)

পূর্ববঙ্গগীতিকায় 'বগুলার বারমাসীতে' মনসার ব্রতাচারের কথা পাই—

"শাওন বাওনা মাস আখাল পাখাল পানি।

মনসা পূজিতে কন্যা হইল উৎযোগিনী॥

কান্দিয়া বসাইল ঘট আপনার গিরে।

প্রাণপতি ঘরে আইসে মনসার বরে॥

চাচর চিক্কণ কেশে গিরটি মাজ্ঞিল।

নূতন পিটালি দিয়া আলিপনা দিল॥

পঞ্চনাগ আঁকে কন্যা শিরের উপরে।

মনসা দেবীরে আঁকে অতি ভক্তি ভরে॥

শির নোয়াইয়া করে শতেক পন্নতি।

বর দাও মনসা গো ঘরে আইওক পতি॥"[৫২]

আবার বিভিন্ন কাব্যে দেখা যায় সাধারণ ব্রতীদের মতই সনকা, রাখালগণ, বেহুলা, জালু-মালু জননী কখনো সম্পদ কামনায়, সন্তান লাভের জন্য, স্বামীর প্রত্যাবর্তনের জন্য, হারানো সম্পদ ফিরে পাবার জন্য, বিপদে রক্ষা পাবার জন্যই মনসার স্তুতি করেছে। মনসামঙ্গলে দেখা যায় স্বর্গের নর্তকী উষা মনসাপূজার প্রতিশ্রুতি নিয়েই মর্ত্যে বেহুলা রূপে জন্মগ্রহণ করেছে। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে' মনসা উষাকে মর্ত্যে আনয়নের পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—

"যখনে বিপদ হয়ে পড়িব সঙ্কটে।

তখনে আসিবা মাতা আমার নিকটে॥

.. ..

মোর বরে হবে তোর সুন্দর আকৃতি।

ত্রিভুবনের স্ত্রী হইতে তুমি হবা সতী॥

অগ্নির জ্বালে তুমি না হবা পীড়ন।

মৈলে মড়া জিয়াইবা হারাইলে পাবা ধন॥" (বিজয়/২০১-২০৫)

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে দেখি ব্রতের ফলের মতই মনসার কৃপায়—

"ঘোড়াশালে ঘোড়া উঠে হাতিশালে হাতি।

দানীগণ উঠে আর সৈন্য সেনাপতি॥" (জগজ্জীবন/৩২৭)

সুতরাং মনসামঙ্গল কাব্য নাগপঞ্চমী ব্রতের উত্তরাধিকারকে বহন করেই কাব্যরূপ পেয়েছে। ব্রতকথার সংক্ষিপ্ততা ধর্ম এখানে নেই, তবে মঙ্গলকাব্যে পূজা প্রচারের শেষে স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ স্বর্গ থেকে মর্ত্যে এসে পূজা প্রচার করেছে। ব্রতের কাহিনী অনেক বেশী লৌকিক, আর মঙ্গলকাব্যগুলিতে স্বর্গ-মর্ত্য একাকার হয়ে গেছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও মূলত ব্রতকথা ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী যে ব্রতকথার দেবী

চণ্ডী— সে প্রসঙ্গটি বিভিন্নভাবে লক্ষ করা যায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রতকথার দেবী হিসাবে লৌকিক চণ্ডীর প্রায় এগারো প্রকার বিভিন্ন রূপ প্রচলিত আছে; যথা— নাটাইচণ্ডী, উড়নচণ্ডী, ঘোরচণ্ডী, কুলইচণ্ডী, শুভচণ্ডী বা সুবচনী, খাড়া শুভচণ্ডী, রথাইচণ্ডী, উদ্ধারচণ্ডী, রূপচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, বসনচণ্ডী, অবাকচণ্ডী, কলাইচণ্ডী, ককাইচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী, রণচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি। মঙ্গলচণ্ডীর আবার বিভিন্ন রূপ আছে— নিত্যা মঙ্গলচণ্ডী, জয় মঙ্গলচণ্ডী, হরিষ মঙ্গলচণ্ডী, কুলুই মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী, উদয় মঙ্গলচণ্ডী, ভাউত্তা মঙ্গলচণ্ডী, মঙ্গল সংক্রান্তি ইত্যাদি। আশুতোষ ভট্টাচার্য শিবাচণ্ডীর কথা উল্লেখ করেছেন।[৫৩] বাংলার লৌকিক চণ্ডীপূজার বিভিন্ন রূপ এখানে মিলিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দেবী চণ্ডী অবশ্য মঙ্গলচণ্ডী। বস্তুত দেবী দুর্গারই একটি রূপ হল চণ্ডী; চণ্ড বিনাশিনী বলে তার নাম চণ্ডী, জীবধাত্রী বলে তার নাম মঙ্গলচণ্ডী, বরাভয়দায়িনী বলে তার নাম অভয়া। অনেক কবির মতে মঙ্গলাসুর নিধনকারিনী বলে এই দেবী মঙ্গলচণ্ডী। ব্রতকথার দেবী চণ্ডীপূজা অবশ্য বছরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়, যেমন বৈশাখ মাসে হরিষ মঙ্গলচণ্ডী, জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত জ্যৈষ্ঠ মাসে, নাটাইচণ্ডী অগ্রহায়ণ মাসে পূজিত হয়। এছাড়া বারোমেসে ব্রত হিসাবে চণ্ডীপূজা হয়ে থাকে, শুভচণ্ডী বা সুবচনীর ব্রত একটি জনপ্রিয় লৌকিক ব্রত; বছরের যে কোন সময় এর পূজা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

প্রতিটি ব্রতের শেষে ব্রতীরা দেবীর মাহাত্ম্যসূচক একটি গল্প বলে; লক্ষণীয় বিষয় যে, চণ্ডীর বিভিন্ন রূপভেদ থাকায় তাদের মাহাত্ম্যসূচক গল্পগুলিও পৃথক পৃথক। হতে পারে ব্রতের এই দেবীরা বিভিন্ন সমাজে পূজিত হত এবং তার জন্য পৃথক পৃথক ব্রতকথারও উৎপত্তি হয়েছে। তবে প্রতিটি ব্রতের দেবীর লক্ষ একই অর্থাৎ দেবীরা অসাধ্য সাধনের দেবী, হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার দেবী, সাংসারিক সুখ ও সমৃদ্ধি দানের দেবী। নাটাই চণ্ডী ব্রতের কাহিনীটি নিম্নরূপ—এক সদাগর তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সুখের সংসার। এক স্ত্রীর মৃত্যুর পর সদাগর বাণিজ্যে যায়। আর এদিকে বিমাতা সতীনের সন্তানদের দিয়ে গরু, ছাগল চরিয়ে নিতে থাকে। একদিন তাদের গরুগুলি হারিয়ে যায়; তখন এক গৃহস্থ ও গৃহিণীর পরামর্শে তারা নাটাইচণ্ডীর পূজা করে হারানো গরুগুলি ফিরে পায়। অন্যদিকে তাদের সদাগর পিতা প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে, তাদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান হয়। লক্ষ করা যাচ্ছে যে, নাটাই চণ্ডীর ব্রত কাহিনীর সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক কাহিনীর সামান্য মিল আছে। মঙ্গলচণ্ডী ব্রত পালিত হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম মঙ্গলবার থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত। মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের কাহিনী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর অনুরূপ। তবে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর দুটি খণ্ড, আখেটিক খণ্ড ও বণিক খণ্ডের মধ্যে শুধুমাত্র বণিক খণ্ডই এখানে আছে এবং বণিক খণ্ডের ধনপতি-শ্রীমন্ত-খুল্লনা- লহনা-সংক্রান্ত কাহিনীর ধারাটিই বজায় আছে। হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের কাহিনীটি আরও অন্যরকম। প্রতি বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবারে ব্রতীগণকে এই ব্রত নিতে হয়। ব্রত কাহিনীটি গড়ে উঠেছে এক বামনী ও তার গয়লানী সইকে অবলম্বন করে। বামনীর পরামর্শে হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করে গয়লা-বৌ অসাধ্য সাধন করে কিভাবে তা দেখা যায় এখানে। হরিষ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পালন করলে ব্রতীর কখনো চোখের জল পড়ে না অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট থাকে না। আবার সুবচনী বা শুভচণ্ডীর ব্রত একটি বারোমেসে ব্রত। বিবাহিত নারীরাই এই ব্রতের ব্রতী। ব্রতের শেষে সধবাদের সুপারি, পান, নাড়ু, কলা, চিনি, তেল, সিঁদুর দিতে হয়। সুবচনী ব্রতের কাহিনী গড়ে উঠেছে কলিঙ্গ দেশের এক দরিদ্র বামুন, তার বামনী ও পুত্রকে কেন্দ্র করে। দেশের রাজার খোঁড়া হাঁস মেরে মাংস খাওয়ার অপরাধে দরিদ্র বামুন-বালককে কারারুদ্ধ করা হয়। পরে সুবচনী মায়ের কৃপায় তার মুক্তি হয় এবং রাজকন্যার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ধন ঐশ্বর্যে তার ঘর ভরে ওঠে। এভাবে ব্রতের কাহিনী প্রচারিত হয়।

দেবী চণ্ডী সম্পর্কিত এসব কাহিনী থেকে মনে হয় হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ও সুবচনী ব্রতের কাহিনী অনেক প্রাচীন, কারণ এখানে এক ভেদাভেদ হীন, নাম-পরিচয়হীন এক সমাজের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আবার মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা অপেক্ষা নাটাইচণ্ডীর ব্রতকথাটি প্রাচীন, নাটাইচণ্ডীর ব্রতে কাহিনী দানা বেঁধে উঠতে পারেনি, অবশ্য এখানে

বণিক সম্প্রদায়ের কথা আছে। মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কথাটি অপেক্ষাকৃত ঘনপিনদ্ধ ও বলিষ্ঠ। পরবর্তীকালে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ কাহিনীকে ভিত্তি করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য কাহিনী অপেক্ষা চণ্ডী সম্পর্কিত অন্যান্য ব্রতের কাহিনীর তফাত এখানেই— প্রথমতঃ ব্রতকথার গল্পগুলিতে কোন বাঁধন নেই, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কাহিনীকে প্রসারিত করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বিস্তারিত হলেও কাহিনী আরও বলিষ্ঠতা লাভ করেছে।

দ্বিতীয়তঃ ব্রতের কাহিনীর চরিত্রগুলি নাম-পরিচয়হীন, বিশেষত্বহীন ; তাদের ব্যক্তিক পরিচয় নেই। মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের কাহিনীর চরিত্রগুলির নাম পরিচয় থাকলেও তারা ব্যক্তি-পরিচয়হীন টাইপ চরিত্র। অপরদিকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্রগুলি অনেক স্বাভাবিক এবং নাম পরিচয়-যুক্ত খানিকটা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তৃতীয়তঃ ব্রতকথার দেবদেবী চরিত্রগুলির কোন মাহাত্ম্য নেই। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ স্বর্গের দেবতা হলেও মাঝে মাঝে মর্ত্যের মানবী হয়ে উঠেছে আবার মাঝে মাঝে দেবী স্বরূপটিও প্রকটিত হয়েছে। আর ব্রতকথার দেবীগণ নিছক অলক্ষে বিরাজমান দেবী।

কাহিনীর বাস্তবতা, দেবী চণ্ডীর অলৌকিক ভূমিকা, কমলেকামিনী ইত্যাদি প্রসঙ্গ কবিকঙ্কণকে মুগ্ধ করেছিল, তাই সম্ভবত তিনি মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথাকে সম্প্রসারিত করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। মুকুন্দের পূর্বে মানিক দত্ত ও দ্বিজ মাধব মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের কাহিনীকে আশ্রয় করেই কাব্য রচনা করেছিলেন। মুকুন্দ চক্রবর্তীই একমাত্র মঙ্গলচণ্ডী ব্রতকথাকে সার্থক কাব্যে রূপায়িত করতে পেরেছিলেন। মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের কিংবা ব্রতকথার বহু উপাদান চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে, যেমন ব্রতকথাগুলি প্রধানত নারী সমাজের বিষয়, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও দেখি প্রথমেই দেবী চণ্ডী স্ত্রীলোকের পূজা নেওয়ার মনস্থ করেছে। কাব্যের প্রস্তাবনা অংশে কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"স্ত্রীলোকের পূজা নিতে দেবী কৈলা মতি।
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করেন পার্ব্বতী॥
ডাকিয়া আনিল রত্নমালা শশিমুখী।
পরমাসুন্দরী কন্যা ইন্দ্রের নর্ত্তকী॥" (মুকুন্দ/৯১)[১]

সুতরাং রত্নমালাকে শাপগ্রস্ত করে খুল্লনা রূপে জন্মগ্রহণ করানো হল। ব্রতকথায় এ সমস্ত কাহিনী নাই অর্থাৎ ব্রতকথার সংক্ষিপ্ততা ধর্ম এতে রক্ষিত হয়নি। আরও বিভিন্নভাবে লক্ষ করা যেতে পারে— চণ্ডীমঙ্গল মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথারই রূপান্তর। যেমন, খুল্লনা ছাগল চরানোর সময় হারানো ছাগল সন্ধান পাবার জন্য চেষ্টা করেছে, তখন দেখতে পেয়েছে দেবকন্যাদের, এরা দেবী চণ্ডীর আটজন সখী। তারা খুল্লনার কাছে চণ্ডীমাহাত্ম্য কীর্তন করেছে এবং হারানো ছাগল ফিরে পাবার জন্য চণ্ডীর পূজা করার পরামর্শ দিয়েছে—

"আমরা ইন্দ্রের সুতা সকল ভগিনী।
করিতে চণ্ডীর পূজা এসেছি অবনী॥
পূজার উচিত স্থান এ ভারত ভূমি।
বিপদ হইবে দূর ব্রত কর তুমি।" (ঐ/১১৮)[২]

আবার দেখি রত্নমালাকে শাপগ্রস্ত করে মর্ত্যে প্রেরণ করলে রত্নমালা বিলাপে বলেছে, সে চণ্ডীর ব্রত প্রচার করবে-

"অবনীমণ্ডলে যাব তোমার কিঙ্করী হব
করাইব ব্রতের বিধান॥" (ঐ/৯২)[৩]

ব্রতের প্রচারার্থেই খুল্লনার জন্ম, তাই 'খুল্লনার রূপ' অংশে আছে—

"দেবীর ব্রতের তরে খুল্লনা বেণের ঘরে
রম্ভাবতী সফল মানিল॥"(ঐ/৯৩)[৪]

রম্ভাবতীর ছদ্মবেশে 'খুল্লনাকে ছলনা' অংশে দেখা যায় চণ্ডীব্রতের প্রসঙ্গটি—

"এমন স্বপন তারে দিয়া মহেশ্বরী।

নিজ ব্রতে নিয়োজিল অষ্ট বিদ্যাধরী ॥
বিদ্যাধরীগণ ব্রত করে সরোবরে।
ছেলি লুকাইয়া মাতা রহিল অন্তরে ॥" (ঐ/১১৬)[৫]

শাপগ্রস্থ মালাধরকে দেবী নির্দেশ দিয়েছে—

"দেবমানে মহীতলে থাক চারি মাস।
কর গিয়া অভয়ার ব্রতের প্রকাশ ॥" (ঐ/১৩৮)[৬]

'অষ্টমঙ্গলায়' কবি বলেছেন—

"এই ব্রত ইতিহাস শুনিলে কলুষনাশ
কলিযুগে হইল প্রচার ॥" (ঐ/২৩৭)[৭]

খুল্লনা হল চণ্ডীর ব্রতদাসী; তাই পদ্মাবতী চণ্ডীকে বলে—

"ধনপতি নাম তার যুগল রমণী।
তোমার ব্রতের দাসী খুল্লনা বেণেনী ॥" (ঐ/২০৪)

কখন চণ্ডীর ব্রত করতে হয় সে সম্পর্কে কবি উল্লেখ করেছেন—

"কলিকালে চন্ডিকার হইল প্রকাশ।
যার যেবা মনোরথ পুরে তার আশ ॥
ব্রাহ্মণ শুনিলে ধর্মশাস্ত্রের ভাজন।
যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিব ক্ষত্রিগণ ॥
বৈশ্যেতে শুনিলে হয় বাণিজ্যেতে মতি।
শূদ্রেতে শুনিলে সুখ মোক্ষ পায় গতি।" (ঐ/২৪৩)

মোক্ষলাভের বিষয়টি অবশ্য চৈতন্যযুগের দান। আবার মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলেও চণ্ডীব্রতের কথাই বলা হয়েছে। চণ্ডী নারদকে এমন পূজা প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছে যা প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হতে পারে, এবং মানিক দত্ত তিন'শ ষাটটি পদে ব্রতকথা সম্পূর্ণ করার কথা বলেছেন। কালকেতুর কাহিনীতে চার দিনের ব্রতকথা সমাপ্তি এবং ধনপতির কাহিনীতে অবশিষ্ট চার দিনের ব্রতকথা বর্ণনা করা হয়েছে—

"চারিদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত হইল ॥
চারিদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত করিঞা।
বসিলা ভবানী দেবী চিন্তাযুক্ত হয়া ॥" (মানিক/১৭০)

পূজা প্রচারের শেষে স্বর্গের নর্তকীকে দেবী আবার স্বর্গে ফিরিয়ে দিয়েছে, দেবী বলেছে—

"দুর্গা বলে চারিভক্ত লইয়াছিলাম আমি।
মর্থে ব্রত পূর্ণ হৈল নিত্তকী লেহ তুমি ॥" (ঐ/৩৭২)

মানিক দত্তের কাব্যের শেষ অংশের নাম 'ব্রতকথা'। ব্রতকথা বলেই কবি শেষে বলেন—

"ব্রতকথা শুনি সভে করহ প্রনতি।
গাইল মানিক দত্ত মধুর ভারতী ॥" (ঐ/৩৭৬)

দ্বিজ মাধব রচিত ' সারদামঙ্গল' কাব্যে একটি ছিন্ন অংশে আছে—

"সভার মঙ্গল ঘট ব্রতের স্বরূপা।
সকলি সম্পূর্ণ হয়ে জারে কর কৃপা ॥"[৫৪]

চণ্ডীর ব্রত করলে কি ফললাভ হয় এবং ব্রতের অবহেলা করলে কি ফল হয় সে সম্পর্কে কোচবিহারের কবি দ্বিজ

মাধবচন্দ্র 'চণ্ডিকার ব্রতকথা' গ্রন্থে লিখেছেন—

"দেবী বোলে কারাগারে বন্ধন সহিত।
আছেন জনক তব হইয়া দুঃখিত॥
ব্রতনিন্দা অপরাধ করিছে আমার।
তার ফল ফলিয়াছে শুনহ কুমার॥
বাতরোগ পীড়িত কুবেশ অতিশয়।
ধনজন হীন হয়া আছে এ সময়॥
অখন আমার এহি প্রসাদ পাইয়া।
সর্ব্বমতে শুভযুক্ত নিজ দেশে গিয়া॥
করিবে আমার ব্রত তোমার মন্দিরে।
তবে সে তাহার বাতরোগ যাবে দূরে॥
ধনধান্য যুক্ত হয়া নানা ভোগ করি।
রাজত্ব করিয়া অন্তে আপনার পুরী॥
পরিহরি যাবে সবে আমার ভবন।
আমার ব্রতের এহি বিচিত্র কথন॥
ইহাক সতত যে মানুষ পাঠ করে।
ভক্তি করি শুনে কিবা নারী আর নরে॥
বিশেষ মঙ্গলবারে করিয়া পূজন।
শুনিলে পড়িলে কথা করিলে স্মরণ॥
অভীষ্ট ফলদাতার সত্যে সত্যে আমি।
হইব সতত পুত্র জানিবেন তুমি॥"[৫৫]

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের উপকরণ হল আট গাছি দূর্বা ও আটটি তণ্ডুল বা ধান। চণ্ডীমঙ্গলে এই অষ্ট দূর্বা তণ্ডুলের কথা আছে। শ্রীমন্তের কল্যাণ কামনায় এই অষ্ট-দূর্বা তণ্ডুল তার শিরে পাগড়ীতে বেঁধে দেওয়া হয়েছে—

"স্নান করি সদাগর উঠিলেন কূলে।
অষ্ট তণ্ডুল দুর্ব্বা তথা পাইল আঁচলে॥" (মুকুন্দ/২০০)[৮]

মুকুন্দ চক্রবর্তী ব্রতকথাটিকেই সম্প্রসারিত করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। ব্যাধ সমাজের দেবী, বনদেবী, পশু সমাজের রক্ষয়িত্রী চণ্ডীই বণিক খণ্ডে নারী পূজিতা ব্রতের দেবী।

ধর্মঠাকুর রাঢ়বঙ্গে ব্রাত্যদের দেবতা, যদিও সকল শ্রেণীর মানুষই এ পূজা করে থাকে। আমরা জানি 'ব্রাত্য' কথাটি এসেছে ব্রত থেকেই এবং ব্রতাচার পালন করে বলেই তারা ব্রাত্য। মানিকরাম গাঙ্গুলীও বলেছেন- "জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান" (মানিক/২৩)। জানা যায় রামাই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হলেও ধর্মপূজা করে পতিত বা ব্রাত্য হয়েছিলেন এবং ডোম সম্প্রদায়ের পুরোহিত হয়েছিলেন। ধর্মঠাকুর এই ব্রাত্যদেরই দেবতা। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে লিখেছেন— "ধর্ম ব্রাত্যদের ঠাকুর। ব্রাত্যেরা সাবিত্রী-পতিত। তাদের উপাস্য এক ব্রাত্য, মহাদেব ঈশান। ব্রাত্যরা সর্বত্র পূজিত।— অভিজাতদের নিকট তারা নিন্দিত. কিন্তু গণধর্মের ধারক গোষ্ঠীপতি ও গণমণ্ডলীতে তারা অভিনন্দিত।"[৫৬] আর্য সংস্কৃতির বহির্ভূত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকেরা সূর্য উপাসনা করে।ড ঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন — সূর্য দেবতার অশ্বারোহী মূর্তি বৈদিক ও পারসিক ধারার মিশ্রণ।[৫৭] অই ধর্মঠাকুরের পূজায় মাটির ঘোড়া প্রয়োজন হয়। বাংলার মেয়েরা রালদুর্গার ব্রত পালন করে। 'রাল' শব্দটি রাতুল

শব্দের অপভ্রংশ, রাতুল (অর্থাৎ সূর্য) থেকে রাউল > রাল। সে দুর্গা হলেও পুরুষ দেবতা। ব্রতকথায় সে কুষ্ঠরোগের দেবতা বলে উল্লেখ আছে। আবার ইতু ব্রতের সঙ্গেও ধর্মের ব্রতের সম্পর্ক আছে। 'ইতু' শব্দটি এসেছে 'আদিত্য' শব্দ থেকে। অগ্রহায়ণ মাসে ইতুর ব্রত পালিত হয়। এই ব্রতের দেবতার নাম 'করমঠাকুর'। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে করমঠাকুরই ধরমঠাকুরের অন্য নাম।[৫৮] ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সূর্য উপাসনার ধারাটি মিশে গেছে। সুতরাং মনে করা যেতে পারে ধর্ম ব্রত সূর্য ব্রতের একটি প্রচলিত রূপ। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে ধর্মের ব্রত সম্পর্কে উল্লেখ আছে। ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যে রঞ্জাবতীকে ধর্মের ব্রতদাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

"বাজে জোড়া শঙ্খ কাঁসি রঞ্জাবতী ব্রতদাসী
আভিলাষী লভিতে সন্তান ॥" (ঘনরাম/৯১)

মানিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যে ধর্ম ব্রতের কথা পাই। রঞ্জাবতী অন্যান্য বার-ব্রত পালন করার পরও পুত্রসন্তান লাভ করেনি, তাই সামূলার পরামর্শে ধর্মের ব্রত করে। সামূলা রঞ্জাবতীর কাছে ধর্ম ব্রতের মাহাত্ম্যকথা বলে—

"বার ব্রত বিস্তর করিলাম দেবার্চন।
কিছু না করিল সিদ্ধ কিসের কারণ ॥
....
সামুলা কহেন শুন তবে সবিশেষ।
প্রধান পুরুষ পূর্ণ প্রভু ধর্মরাজ।
সেবিলে তাহার পদ সিদ্ধ হয় কাজ ॥
আর লভে চতুর্বর্গ অন্য ফল কতি।
নির্ধনী ধনাঢ্য হয় বন্ধ্যা পুত্রবতী।
অন্ধ কুষ্ঠ আদি করে ব্যাধি উপচয় ॥
সকল ঘুচয়ে ধর্ম হইলে সদয় ॥" (মানিকরাম/৪৯-৫০)

পুত্র কামনায় ধর্ম ব্রত পালন করলে পুত্রসন্তান লাভ হয়, রোগমুক্তি কামনায় ব্রত করলে রোগমুক্তি ঘটে, বিশেষত কুষ্ঠ ব্যাধি নিরাময় হয়। রঞ্জাবতী পুত্র কামনায় চাঁপাইয়ে ধর্মসেবা করে অর্থাৎ ধর্মব্রত করে পুত্র লাউসেন লাভ করে—

"চাঁপায়ে সেবিল ধর্ম শালে দিয়া ভর।
শুনি আনন্দিত সবে পাইল পুত্রবর ॥"(ঘনরাম/১০৫)

মানিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যে দেখি সুরিক্ষার কাছে ধর্ম ব্রতের কথা বলেছে ও কৌশলে আত্মরক্ষার জন্য ব্রতের কিছু নিয়মকানুন বলেছে, যেমন—

"প্রবেশ করিলে পূর্ণ পঞ্চম বৎসরে।
বার বর্ণ সকলে ধর্মের ব্রত করে ॥
ব্রতের নিয়ম শুন বচনের ফল।" (মানিকরাম/২৬৪)

রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যে লাউসেন জামাতির বনিতাদের বলেছে সে ধর্মের উপাসক, এবং প্রতি শুক্রবার ধর্ম-একাদশী ব্রত পালন করে—

"কি করিব পানগুয়া চন্দন শীতল।
গৃহস্থ লোকের হাথে নাহি খাই জল ॥
শিশু কাল হইতে আমি ধর্মের তপসী।

শুক্রবার দিনে করি ধর্ম একাদশী॥
শনিবারে নিয়ম ভাঙ্গিলে জল খাই।
ধর্মের সেবক আমি সুখ নাহি চাই॥" (রূপরাম/১৫৩)

মনে হয় রামাই পণ্ডিত বিরচিত ধর্মপূজা বিধান ও সংযাত পদ্ধতি আসলে ধর্মের ব্রতবিধি যা অত্যন্ত কঠোরভাবে পালিত হত। ধর্মের গাজন আসলে শিবের গাজন, এবং উভয়ের আচার বিধি প্রায় একই রকম। রামাই পণ্ডিত ধর্মের ব্রতকে বিধিবদ্ধ করেন। তাছাড়াও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিতেও ধর্মদেবের উল্লেখ পাওয়া যায়। রঞ্জাবতীর চাঁপাইয়ে ধর্মসেবা বা শালেভর, লাউসেনের চাঁপাইয়ে ধর্মসেবা ধর্মেরই কঠোর ব্রতাচার। ধর্মের ব্রতপালন করলে অসাধ্য সাধন করা যায়, লাউসেন ধর্ম ব্রত করে পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উদয় ঘটায়। ব্রতের দেবতারা নারী হলেও ধর্ম ব্রতের দেবতা পুরুষদেবতা এবং এর স্রষ্টা পুরুষ, ব্রতের বিধানদাতাও পুরুষ। এসমস্ত তথ্যই প্রমাণ করে ধর্মের ব্রত অনেক পরবর্তীকালে প্রচলিত হয়েছে, অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য রচনার পরে ধর্মব্রত প্রচারিত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন— বৈদিক একাদশী ব্রতের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের আনুষ্ঠানিক পূজা বিষয়ে হরিশ্চন্দ্র কাহিনীর সম্পর্ক আছে। ডঃ সেনের ভাষায়— "ধর্ম-ঠাকুরের আনুষ্ঠানিক পূজার বিষয়ে যে সবচেয়ে পুরানো গল্পটি পাই, হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী, তাহাতে একাদশী ব্রতের ছাপ পড়িয়াছে।"[৫১] ঋক্‌বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতাশ্ব কাহিনী আছে তার সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র পালার মিলই বেশী। আবার ধর্মের অনুষ্ঠানে বৈদিক শ্লোকের প্রভাবও লক্ষ করেছেন ডঃ সেন।[৬০] সুতরাং ধর্মঠাকুরের ব্রতের সঙ্গে বৈদিক আচারের সম্পর্ক আছে এবং পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্র পালাটিই ধর্মের ব্রতকথায় পরিণত হয়েছে। ডঃ সেনের অনুসরণে বলা যায় লাউসেনের গল্পটি হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে।

যদুনাথের হরিশ্চন্দ্র কাহিনী আসলে ব্রতকথা। ধর্মমঙ্গলে অপুত্রক রঞ্জাবতীকে সামুলা হরিশ্চন্দ্র ও লুইচন্দ্রের কাহিনী শুনিয়েছে এবং হরিশ্চন্দ্রের পুত্রলাভের কথা শুনে রঞ্জাবতী চাঁপাইয়ে শালেভর দিয়ে পুত্রলাভ করেছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর দু'টি ভাগ—হরিশ্চন্দ্রের পালা ও লাউসেনের কাহিনী। আসলে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই ধর্মের ব্রতকথা। হরিশচন্দ্র ও লাউসেনের উভয় কাহিনী সমান্তরাল ভাবে ধর্মমঙ্গল কাব্যে স্থান পেয়েছে, কিন্তু হরিশচন্দ্র কাহিনী কাব্যে সামান্য অংশ হলেও মূল কাহিনী লাউসেনের কাহিনী। সুতরাং হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী পল্লবিত হয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্য গড়ে না উঠলেও, মূল ভাবটিকে নিয়ে লাউসেনের কাহিনী গড়ে উঠেছে ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় ব্রতকথার উপর ভিত্তি করেই ধর্মমঙ্গলকাব্য গড়ে উঠেছে।হরিশ্চন্দ্রের পালাতে ব্রতকথার সংক্ষিপ্ততা ও স্বল্প চরিত্রের উপস্থিতি আছে, তাছাড়া লাউসেন কাহিনীর সঙ্গে এ কাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই। আর এর সঙ্গে কিছু কিছু রূপকথার কাহিনী যুক্ত হয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যকাহিনী তৈরী হয়েছে। হরিশ্চন্দ্র কাহিনী ও লাউসেন কাহিনীর লক্ষ্য কিন্তু এক।

শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য প্রকৃতপক্ষে ব্রতকথারই রূপান্তর। শিবমঙ্গল কাব্য রচিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই শিব সম্পর্কিত গীত ও শিবচতুর্দশী ব্রত প্রচলিত ছিল। বাংলা মহাভারত ও ধর্মমঙ্গল কাব্যে শিবচতুর্দশী ব্রতের কথা ও ব্রতের মাহাত্ম্যকথা পাই। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ঘনরাম চক্রবর্তী লিখেছেন—

"শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী শঙ্করের পূজা॥
এই ব্রত অসুর অমর নরলোকে।
ভবিষ্য পুরাণ কথা শুনি কবিমুখে॥
পার্ব্বতী প্রকাশ কৈল্য উদ্ধারিতে জীব।
এই ব্রতে সর্ব্বথা সদয় সদাশিব॥
তিথির মহিম্যা কিছু নিবেদন করি।
ঘুণাক্ষর ন্যায় ব্রতে ব্যাধ গেলা তরি॥" (ঘনরাম/২১৮)

এরপর শিবচতুর্দশী ব্রতের ব্যাধ কাহিনীর প্রসঙ্গ অর্থাৎ ব্রতকথা বলা হয়েছে। শিবঠাকুরকে কেন্দ্র করে দু'রকমের ব্রত প্রচলিত ছিল — শিব ব্রত ও শিবচতুর্দশী ব্রত। শিব ব্রত বা শিবঠাকুরের ব্রত বৈশাখ মাসে পালিত হয়। শিবায়ন কাব্য এবং শিবচতুর্দশী ব্রতকাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই। আসলে শিব সম্পর্কিত কাহিনীর একটি স্বতন্ত্র ধারা থেকেই শিবচতুর্দশীর ব্রতের কাহিনী এসেছে। রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন কাব্যে কিন্তু শিবচতুর্দশী ব্রত কাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই। রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যে শিবচতুর্দশী ব্রত মাহাত্ম্যকথা বলেছেন। তিনি 'শিবরাত্রি বিধি' অংশে লিখেছেন—

"শঙ্কর সন্তোষ হয়্যা শঙ্করীকে কন।
বিধুমুখী শুন ব্রতরাজ বিলক্ষণ॥
ফাল্গুনে যে চতুর্দ্দশী কৃষ্ণপক্ষে হয়।
তাহার যে রাত্রি তাকে শিবরাত্রি কয়॥
. . . . . .
সপ্ত দ্বীপেশ্বর হয়্যা হয় কামাচারী।
তিথির মাহাত্ম্য শুন ত্রিপুর-সুন্দরী॥" (রামেশ্বর/২০০-২০১)

অতঃপর শিবচতুর্দশী ব্রতকাহিনী অর্থাৎ ব্যাধের শিবচতুর্দশী ব্রতের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শিবচতুর্দশীর ব্রতের কাহিনী হল 'মৃগলুব্ধ কাহিনী'। রাজা মুচকুন্দ শিবচতুর্দশীর ব্রত উপলক্ষে ব্যাধের শিবচতুর্দশী ব্রত উদ্‌যাপনের কাহিনী শুনে সশরীরে স্বর্গে গমন করেছিল। শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যে শিবকাহিনী থাকলেও তার রচনাকাল শৈবধর্মের বিভগ্নতার যুগ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শৈবধর্ম পুনরায় নতুন করে বিকশিত হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। লৌকিক শিবকাহিনী ও মৃগলুব্ধ কাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই, মৃগলুব্ধ কাহিনীর শিবঠাকুর লৌকিক শিব নয়; শিবপুরাণগুলিকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠা পৌরাণিক শিবকাহিনী অবলম্বনে মৃগলুব্ধ কাহিনী তৈরী হয়েছিল যা ব্রতকথার মত সংক্ষিপ্ত এবং স্বল্প কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। মনে হয় এটিই শিব সম্পর্কিত প্রকৃত কাহিনী। কালক্রমে ধর্ম সমন্বয়ের যুগে লৌকিক শিবের সঙ্গে পৌরাণিক শিব এক হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং লৌকিক শিব কাহিনীর সঙ্গে ব্রতকথার কাহিনী স্থান লাভ করেছে। রামরাজা ও রতিদেব মঙ্গলকাব্যের আদলে মৃগলুব্ধ কাহিনী ভিত্তি করে শিবমঙ্গল নামে কাব্য রচনা করেন।

প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি ছাড়াও প্রচুর অপ্রধান মঙ্গলকাব্য আছে, লক্ষ্মীমঙ্গল বা কমলামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, কপিলামঙ্গল, কালিকামঙ্গল ইত্যাদি। অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে কালিকামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল প্রধান। অন্নপূর্ণা পৌরাণিক দেবী হলেও ব্রতের দেবী। অন্নপূর্ণা অন্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ভারতচন্দ্র অবশ্য ব্রতকথা নির্ভর করে অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেননি। অন্নদামঙ্গলের কাহিনী ভারতচন্দ্রের নিজস্ব পরিকল্পনা। অন্নপূর্ণার ব্রত জনসমাজে প্রচলিত ছিল, ভারতচন্দ্র কাব্যে অন্নপূর্ণার ব্রতের কথা উল্লেখ করেছেন একবার বসুন্ধরের মুখে এবং আরেকবার ছদ্মবেশী দেবী অন্নপূর্ণার মুখে। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"অষ্টমীরে পর্ব্ব কয় ইথে রতি যুক্ত নয়
অন্নদার ব্রততিথি তায়।" (ভারতচন্দ্র/১৩৫)

কিংবা.

"এই যে অষ্টমী পুণ্যদা এ তমী।
অন্নদার ব্রততিথি।" (ঐ/১৫১)

ব্রতের প্রধান কামনাই হল পার্থিব। তাই অন্যান্য ব্রতের মতই অন্নদার ব্রত পালন করলে অন্নহীনের অন্ন হয়, দরিদ্রের ধন সম্পদ ও সুখ সমৃদ্ধি হয়, তাই অন্নপূর্ণা হরিহোড়কে জানায় অন্নদার ব্রত পালন করলে মাটি মুঠা

ধরলে সোনা মুঠা হবে, শূন্য হাঁড়ি ভরে অন্ন-ব্যঞ্জন হবে। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পাড় গিয়া॥
হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে।
কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে॥"(ঐ/১৪৪)

দেবীর কৃপায় কাঠের সেঁউতি ম্যাজিকের মত 'অষ্টাপদ'-এ (সোনা) পরিণত হয়। অন্নদামঙ্গলের মূল ভাবটি যে ব্রতের মত, ঈশ্বরী পাটনীর কামনাতেই তার প্রকাশ। অন্নদামঙ্গলে ব্যাসকাহিনী ও হরিহোড়ের কাহিনী দু'টি স্বতন্ত্র কাহিনী অংশ। ব্যাসকাহিনী ভারতচন্দ্রের পরিকল্পনা আর হরিহোড়ের কাহিনী ব্রতকথার মত সংক্ষিপ্ত। যদিও এখানে চরিত্র সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যায়, তবুও হরিহোড়ের কাহিনীকে অন্নদার ব্রতকথা ধরা যেতে পারে। আবার অন্নদার 'এয়োজাত' অংশটি ব্রতাচার ভিন্ন কিছু নয়। বাঙালী মেয়েরা দলবদ্ধভাবে কখনো কখনো ব্রতপালন করে থাকে, অন্নদার এয়োজাত অংশে এই ছবিই পাওয়া যায় । কালিকামঙ্গল অবশ্য চরিত্রধর্মে মঙ্গলকাব্য বা ব্রতকথা নয়। কালিকাদেবীর ভূমিকা এখানে গৌণ। আসলে সপ্তদশ শতকে যে রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ধারা গড়ে উঠেছিল কালিকামঙ্গলও তাই। দেবী কালিকার নামে বিদ্যাসুন্দরের অবৈধ প্রেম কাহিনীকে পরিশুদ্ধি ঘটানো হয়েছে মাত্র। তাই কাব্যটি কালিকামঙ্গল অপেক্ষা বিদ্যাসুন্দর নামেই পরিচিত। অন্যান্য অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি আসলে ব্রতকথা মাত্র, যেমন ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যটি। ষষ্ঠী ব্রতের দেবী; সন্তানের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠী ব্রত পালন করা হয়ে থাকে। বারোমেসে ষষ্ঠী ছাড়াও জ্যৈষ্ঠ মাসে ও পৌষ মাসে ষাঁড়াষষ্ঠী এবং চৈত্র মাসে অশোকষষ্ঠী, শ্রাবণ মাসে লোটনষষ্ঠী, ভাদ্র মাসে মন্থনষষ্ঠীর ব্রত পালিত হয়। সবগুলিই সন্তান কামনায় ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় পালিত হয়।আবার বাঙালী সমাজে সন্তানের জন্মের ছয় দিনে ছয়-ষষ্ঠী পূজা করার রীতি আছে। ধারণা করা হয় ঐ দিন নবজাতকের বা নবজাতিকার ভাগ্যলিপি লেখা হয়, তাই আঁতুরঘরে মসীপত্র রাখা হয়। মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলকাব্যে ষষ্ঠী ব্রত পালনের কথা আছে। কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী গড়ে উঠেছে অরণ্যষষ্ঠী ব্রতের গেরস্থ-বৌ আর মা ষষ্ঠীর বাহন কালো বিড়ালীর কাহিনী অবলম্বনে। কৃষ্ণরাম ব্রতকথার ষষ্ঠী কাহিনীকে পাঁচালীর রূপ দিয়েছেন মাত্র। কাব্যে ষষ্ঠী ব্রতের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

"সোমবারে ষষ্ঠী তিথি যেই মাসে মাসে।
সেদিন কেবল পূজা হবে স্বর্গ বাসে॥
পৃথিবী পাতালে পূজা নবে সেইদিন।
কেহ যদি করে পূজা হবে পুত্রহীন॥
যেই মাসে শনিবারে ষষ্ঠী তিথি হবে।
কেবল পাতালে পূজা অন্য ঠাঁই নবে॥
রবি শুক্র পূজ পূজ বুধবার বৃহস্পতি।
পৃথিবীতে পূজিবে যতেক পুত্রবতী॥" (কৃষ্ণরাম/১৬২)

ষষ্ঠী ব্রতের ফলাফল সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"দুর্গা নামে ষষ্ঠী পূজি আশ্বিনে আনন্দ।
যেই বর মাগে পায় তার নাই সন্দ॥
কার্ত্তিকে শ্মশান ষষ্ঠী পূজে বর বর জুড়ি।
শ্মশান হইতে পুত্র আইসে বাহুড়ি॥
বার মাসে বার ষষ্ঠী যেবা নারী করে।
রোগশোক দুঃখ কভূ নহে তার ঘরে॥" (ঐ/১৬১)

অনুরূপভাবে লক্ষ্মীমঙ্গল বা কমলামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, কপিলামঙ্গল ব্রতকথারই রূপান্তর মাত্র। বাঙালী সমাজে গো-দেবতা পূজ্য। মঙ্গলকাব্যগুলিতে গো-দেবতা কপিলার কাহিনী বিশেষ স্থান লাভ করেছে। তাই দেখা যায় পরবর্তীকালে গো- দেবতা কপিলা অবলম্বনে কপিলামঙ্গল কাব্য গড়ে উঠেছে। বাঙালী সমাজে নারীরা গবাদি পশুর মঙ্গল কামনায় ও তার আশীর্বাদ লাভের জন্য বৈশাখ মাসে গো-কল ব্রত পালন করে থাকে। কপিলামঙ্গল গো-কল ব্রতেরই রূপান্তর।কপিলা মঙ্গলে বলা হয়েছে—

"কপিলামঙ্গল কথা শুন ইতিহাস।
ষুনিলে সংসারের পাপ হইব বিনাশ॥
. . . . . .
সংসারের মধ্যে ভাই পুজিবে গোধন।
জার সেবা আপনি করিলা নারাঅন॥[৬১]

অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি ব্রতকথা ও পাঁচালীর ক্ষেত্র কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রথম শ্রেণীর কবি প্রতিভার অভাবে অনেক পরবর্তীকালে উদ্ভূত অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি শেষ পর্যন্ত ব্রতকথা ও পাঁচালীর আকারে আজও রয়ে গেছে।

লোকসমাজে প্রচলিত ব্রতকথার দেবীরাই ধীরে ধীরে উচ্চবর্ণের পারিবারিক অন্তঃপুরে জায়গা করে নেয়; উচ্চবর্ণের অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকারের পথটি কিন্তু খুব একটা মসৃণ ছিল না। দেবী মনসা কিভাবে বণিক সমাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিল? মনসামঙ্গলে দেখা যাচ্ছে মনসা জালু-মালুর জননীকে ধন দিয়ে বশীভূত করে পূজা আদায় করল। চাঁদ সদাগরের ঘরণী সনকা সখী পরিবেষ্টিত হয়ে স্নানে যাওয়ার সময় হঠাৎ জালু-মালুর ঘরে সম্পদ বৃদ্ধিতে বিস্মিত হয়। বিপ্রদাসের কাব্যে সনকা জাল-মালু জননীকে বলেছে—

"সনকা বলেন শুন জালুর জননী
কেমন দেবতা পূজা করিস আপনি।
অদ্য অন্নশূন্য তুমি ছিলা এই স্থান
এতেক বিভব হৈল কহ ত কারণ।" (বিপ্রদাস/৮৭)

ক্ষেমানন্দের কাব্যেও অনুরূপ প্রসঙ্গ দেখতে পাই। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে মনসা স্বপ্নে গুলুকাকে নির্দেশ দিয়েছে–

"স্বপ্নে আসি বলে শুলকারে।
যখন যে বর চাবে তখন তাহাই পাবে,
ঘট গিয়া আন পূজিবারে॥" (বংশীদাস/৭১)

দেবী মহিমার কথা শুনে সনকা মুগ্ধ হয়। সম্পদের প্রলোভনে তার ভক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সনকা নিছনির কাছ থেকে দেবী পূজার পদ্ধতি শিখে মনসার ঘটবারি মাথায় নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। জালু-জননীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনসার ঘট দিতে হয়, কারণ সনকা রাজরানী-

"নিছনি শুনিয়া বাণী মহাদুঃখ মনে গণি
রাজরানী কি করিতে পারি।'(বিপ্রদাস/৮৮)

ক্ষেমানন্দের বিবরণ অনুযায়ী সনকা দেবীর ঐশ্বর্য ও মহিমার কথা শুনে ছয় পুত্রের কল্যাণের কথা ভেবে জালু-জননীর নির্দেশ অনুসারে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে জালুমালুর ঘরেই মনসাকে প্রণিপাত করে-

"স্নান করি গেল ত্বরা নিছনির ঘরে।
গলায় বসন দিয়া প্রণিপাত করে॥"(ক্ষেমানন্দ/১৪৮)

বংশীদাসের কাব্যে গুলুকা জালু-মালুকে সম্পদ দিয়ে মনসার ঘট নিজ গৃহে নিয়ে আসে। বংশীদাসের বর্ণনায় —

"শত পণ সুবর্ণ ঝালো লইল জোখিয়া।

ঘটবারি লইল শুনাই মস্তকে তুলিয়া॥

.. ..

ঝালো মালো শুনি তাহা ঘরেতে চলিল।

ঘটবারি লইয়া শুনাই পুরে প্রবেশিল॥" (বংশীদাস/৭২)

বিপ্রদাসও অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন—

"যত্নে লইল সুন্দরী হাতে কাখে দুই বারি

নিজপুরে গেলা রাজরানী॥" (বিপ্রদাস/৮৮)

আর চণ্ডীমঙ্গলে খুল্লনা দেবকন্যাদের কাছে দেবী পূজার কৌশল আয়ত্ব করে পূজা করে নিজ গৃহে। এই ঘটনার সঙ্গে মনসামঙ্গলে রাখালগণের মনসা পূজার মিল আছে। মনে করা যায় অপৌরাণিক দেবদেবীগণের মধ্যে মনসাই আগে অভিজাত অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিল, তাই তার পক্ষে চাঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ এত কঠিন। পরবর্তীকালে দেবী চণ্ডীর পক্ষে এই প্রবেশ অনেক সহজ হয়েছে। বোধহয় শেষ পর্যন্ত ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তার পরিবর্তন এবং বিভিন্ন দেবতার অভেদত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে অন্য দেবদেবীর অনুপ্রবেশ অনেক সহজেই হয়েছিল।

মঙ্গলকাব্য উদ্ভবের পশ্চাদ্‌পটে শুধুমাত্র ব্রতকথাই নয়, পুরাণ-ইতিহাস-রূপকথা-লৌকিক ধর্ম ও লোকসাহিত্যের সম্পর্ক আছে, এসম্পর্কে দু'-এক কথা বলা যেতে পারে। পুরাণগুলির উপর নির্ভর করেই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু উভয় সাহিত্য শাখার মধ্যে মিল যেমন আছে পার্থক্যও তেমনি বিস্তর। মঙ্গলকাব্য ও পুরাণ উভয়ই আখ্যায়িকামূলক রচনা এবং উভয়ই দেবকথামূলক রচনা, কিন্তু দেখা যায় পুরাণের দেবতরা গোলোকবিহারী দেবতা, তাদের অলৌকিক ক্ষমতা অসীম। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবতারা স্বর্গভ্রষ্ট, মঙ্গলকাব্যের নায়ক স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা, কিন্তু ধুলিমাটির স্পর্শে মলিন। তাদের অলৌকিক ক্ষমতা থাকলেও তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, তাই দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই দেবতা মানুষের কাছে ভীত হয়েছে। চাঁদের 'হিন্তাল' লাঠিকে মনসার ভয়, তাই মনসা বলেছে—

"যদি মোর পূজা সে করিবে চাঁদবাণ্যা।

হিন্তালের বাড়িগাছি আগে পেল টান্যা॥

এত শুনি চাঁদবাণ্যার উপজিল হাস।

হিন্তালের বাড়ি আর না কর তরাস॥

.. ..

বেহুলা বিনয় বলে আপন শ্বশুরে।

হিন্তালের বাড়িগাছি টান্যা পেল দূরে॥

শুনিঞা বধূর বোল চাঁদ সদাগর।

হিন্তালের বাড়ি টান্যা পেলে দূরান্তর॥" (ক্ষেমানন্দ/২৯১)

পুরাণের দেবতারা ত্রিভুবন বিজয়ী, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে তাদের একাধিপত্য; মঙ্গলকাব্যের দেবতারা সেখানে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবদ্ধ। মানুষের স্বীকৃতি না পেলে তারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। পুরাণের দেবতারা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আপন পরাক্রম প্রদর্শন করেছে, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবতারা সেখানে হীনতা, ক্ষুদ্রতা ও নিম্নতার পরিচয় দিয়েছে। এদিক থেকে পুরাণের দেবতা অপেক্ষা মঙ্গলকাব্যের দেবতারা অনেক মানবিক, মানবিক মহিমার জয় ঘোষণাই মঙ্গলকাব্যের মূল লক্ষ্য। পুরাণ অপেক্ষা মঙ্গলকাব্যগুলি অনেক বেশী বাস্তব জীবনাশ্রয়ী। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে আবার দেবখণ্ড ও নরখণ্ড বিভাজন আছে, দেবখণ্ডে পৌরাণিক দেবতার কাহিনী আছে, নরখণ্ডে লৌকিক দেবতার কাহিনী বর্ণিত। পুরাণের গঠন অনেক ঘনপিনদ্ধ, আর সেখানে মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক অনেক

শিথিল। মঙ্গলকাব্যের বাঁধাধরা ছক থাকলেও কবিরা অনেকক্ষেত্রেই সামান্য নতুনত্ব দেখাবার চেষ্টা করেছেন তাদের যুগগত প্রবণতা অনুযায়ী; তাই মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলি জাতীয় জীবন ও জাতীয় চরিত্রের অনুসারী হয়ে উঠেছে। যুগগত প্রবণতা অনুযায়ী সমকালীন জীবনকে রূপায়ণের চেষ্টা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দেখা যায়। পক্ষান্তরে পুরাণগুলি একাধারে তত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্র, বাস্তব জীবনের দাবীকে পুরাণকারগণ রক্ষা করেননি। পৌরাণিক দেবমহিমা জনমানসের অন্তঃস্থলে প্রোথিত ছিল বলেই লৌকিক দেবতারা সমাজ বিবর্তনের ধারায় উপরের স্তরে উঠে আসতে শুরু করলেও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ভয়ে বা ভক্তিতে যে কারণেই হোক সাধারণ মানুষ দেবতাকে স্বীকৃতি দিলেও উচ্চতর আদর্শের অভাব দেবচরিত্রকে ভক্তির সিংহাসনে বসায়নি। মূলত অরণ্য বা বৃক্ষতলেই তাদের অধিষ্ঠান হয়, তবে ধীরে ধীরে পৌরাণিক আদর্শের প্রলেপ লাগিয়ে খানিকটা আদর্শায়িত দেব পরিকল্পনা সম্ভব হয়েছিল। পুরাণের সূত্র ধরেই একদা কেবল মাত্র পৌরাণিক দেবভাবনা নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। মঙ্গলকাব্য হলেও কিন্তু লৌকিক মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে বাঙালীর অন্তরের যোগ ছিল, কিন্তু পৌরাণিক দেবভাবনা যুক্ত মঙ্গলকাব্যগুলি সেই স্থান পায়নি। মঙ্গলকাব্যের মতই একই সামাজিক ভাবধারার সূত্র বহন করে মঙ্গলকাব্যের মত অনুবাদ সাহিত্য রচিত হয়েছিল। সংস্কৃত-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদের মাধ্যমে প্রচারিত হলেও লোকজীবনের বহু উপাদান তাতে প্রবেশ করেছে। বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের আদর্শের দ্বারা যেমন মঙ্গলকাব্যগুলি প্রভাবিত হয়েছিল তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুবাদ সাহিত্যও মঙ্গলকাব্যগুলির নিকট ঋণ গ্রহণ করেছে অর্থাৎ দু'টি ধারা পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাই দেখা যায় মঙ্গলকাব্যগুলির ভিতরে বহু পৌরাণিক কাহিনী অনুবাদের মাধ্যমে প্রবেশ করেছে। মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ড পুরাণের আদর্শেই গড়ে তোলা হয়েছে, আর নরখণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৌরাণিক উপাদানের ব্যবহার হয়েছে, যেমন হনুমান প্রসঙ্গটি রামায়ণ ও মহাভারত থেকেই অনুবাদের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলকাব্যে প্রবেশ করেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যটি এবিষয়ে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত। সর্বোপরি পৌরাণিক আদর্শ ও ভাবধারা অনেকাংশে মঙ্গলকাব্যগুলিকে প্রভাবিত করেছে। আবার মঙ্গলকাব্যের কাহিনীও অনেকক্ষেত্রে বাংলা রামায়ণ ও মহাভারতে প্রবেশ করে গেছে। যেমন বাংলা মহাভারতের দাতাকর্ণের কাহিনী ধর্মমঙ্গল থেকেই সামান্য রূপান্তরিত হয়ে প্রবেশ করেছে। আবার মনসামঙ্গলের সঙ্কর গাড়রীর কাহিনী থেকে লৌকিক রামায়ণের রাবণের মৃত্যুবাণ সংগ্রহের কাহিনী গৃহীত হয়েছে। কাজেই মঙ্গলকাব্য গড়ে ওঠার পিছনে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

মঙ্গলকাব্যের পশ্চাদ্‌পটে দূরাগত ইতিহাসের পদধ্বনি শোনা যেতে পারে, যেমন চাঁদ সদাগর ও ধনপতি সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বিবরণ থেকে প্রাচীনকালের বাঙালীর বহির্বাণিজ্যে ও নৌবিদ্যায় পারদর্শিতার কথা পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাণিজ্যযাত্রা ও চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতির রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বা রাজার নির্দেশে বাণিজ্যযাত্রার কথা পাই ভিন্নতর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যগুলিতে বণিক সমাজের প্রাধান্যের কথা লক্ষ করা যাচ্ছে, পণ্ডিতদের মতে পাল যুগে বাংলার সমাজ জীবনে বণিকদের একচ্ছত্রতার কথাই এতে স্থান পেয়েছে, তবে তার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছে বহু যুগের ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান। আবার হাসন-হোসেন পালার মত ঐতিহাসিক তথ্য এক যুগের বিষয় না হলেও মনসামঙ্গলে এমনভাবে স্থান করেছে যা আলাদা করে দেখা কঠিন। ধর্মমঙ্গলে বণিক সমাজের কথা নেই, ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি যে সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল তখন সমাজ জীবন থেকে বণিক সমাজের আধিপত্য হ্রাস পেয়েছে। এখানে লাউসেনের বীরত্ব অনেকের মতে পাল রাজাগণের শৌর্য ও বীর্যের পরিচায়ক। ডোম সৈন্যগণের বীরত্বগাথা, কালু ডোমের দেশত্যাগে রাজার অনুমতি গ্রহণ, ডোমদের বৃত্তি পরিত্যাগ প্রবণতার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তন ঐতিহাসিক ঘটনার ছোঁয়ায় রচিত। অছাড়া বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে কবিগণের আত্মবিবরণীতে তৎকালীন যুগ পরিস্থিতি বর্ণিত।শাসকের অত্যাচার, প্রজার দুর্দশা, ধর্মকলহ, মহেশ্বর জ্বর ও বৈষ্ণব জ্বরের যুদ্ধে

বৈষ্ণব জ্বরের জয়লাভ ও মহেশ্বর জ্বরের পরাজয় ধর্মগত ক্ষেত্রে কিছু কিছু অন্তর্নিহিত সত্য নির্দেশ করেছে। বাঙালী সমাজের গঠনগত যে বিবরণ কবিরা বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে দিয়েছেন তা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মগত বোধ হ্রাস পায় এবং দৈবভক্তির স্থলে যুগচেতনা, যুগরুচি ও মানবিকতার বিকাশ ঘটেছিল তার ছায়াপাত পড়েছে মঙ্গলকাব্যে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন-"অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজের হৃদয় দৈবভক্তিহীন হইয়া পড়িবার ফলে সে যুগের মঙ্গলকাব্যের উপর যুগপ্রভাব পুনরায় কার্যকর হইয়া উঠিল—নিজের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মঙ্গলকাব্যগুলি চারিদিক হইতে যুগের উপকরণ দ্বারা নিজেদের অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল।"[৬২]

মঙ্গলকাব্য ব্রতকথার মত মৌখিক সাহিত্য-ধারাকে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে, শুধু তাই নয়, মৌখিক সাহিত্যের লোককথা ও রূপকথার সঙ্গেও মঙ্গলকাব্যের যোগ আছে। রূপকথা- লোককথা-উপকথা থেকে বহু উপাদান গ্রহণ করে মঙ্গলকাব্যগুলি নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে।সাধারণত লোককথা, রূপকথা ও উপকথার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। গদ্য রচনার মধ্যে দিয়ে যে কাহিনী প্রকাশ করা হয় তাকে লোককথা বলা হয়; ইংরেজীতে যাকে Folk tale বলা হয় বাংলায় তাকে সাধারণভাবে 'কথা' বলেও চিহ্নিত করা হয়। রূপকথা এবং উপকথা লোককথারই অন্তর্গত বিষয়, বস্তুত রূপকথাগুলি লোককথাগুলির মধ্যে আকারে দৈর্ঘ্যে সব চাইতে দীর্ঘতম রচনা; তাছাড়া উহাদের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই। অপরদিকে উপকথাগুলি পশুপাখির চরিত্র কেন্দ্রিক। পশুপাখির আচার-আচরণের মধ্যে দিয়ে যে সকল নীতিকথামূলক কাহিনী রচিত হয় তাকে উপকথা বা Fable বলা হয়। মঙ্গলকাব্যগুলিতে লোককথার এই সমস্ত উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল থেকে ধর্মমঙ্গল পর্যন্ত কাব্যগুলিতে বিভিন্নভাবে ঐ সমস্ত উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যেমন মনসামঙ্গলে অযোনিসম্ভূতা মনসার জন্মকথা অতিলৌকিক জন্ম প্রসঙ্গ; লোককথার দেবদেবীর জন্ম হয়ে থাকে অলৌকিক উপায়ে। মনসামঙ্গলে দেখা যায় স্বাভাবিক ভাবে মনসার জন্ম হয়নি। বিজয় গুপ্ত অযোনিসম্ভবা কন্যা মনসার জন্ম প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"পুষ্পবনে শিবকন্যা আছে একেশ্বরী।
অযোনিসম্ভবা কন্যা পরম সুন্দরী।" (বিজয়/২০)

আবার নেতার জন্ম শিবের ঘাম থেকে, বংশীদাস লিখেছেন—

"প্রচণ্ড রবির তাপে নিকলিল ঘাম॥
ললাট হইতে ঘর্ম্ম পড়ে পদতলে।
মুছিয়া তুলিল শিব নেতের আঁচলে॥
নেত নিঙ্গাড়িয়া ঘর্ম্ম ফেলিল ভূমিতে।
কামরূপা কন্যা গোটা হইল আচম্বিতে॥" (বংশীদাস/৪৫)

রূপকথার মতই মনসামঙ্গলে দেখা যায় কনিষ্ঠার অসাধ্য সাধনের কাহিনী। মনসামঙ্গলে কনিষ্ঠা পুত্রবধূ বেহুলার অসাধ্য সাধনের কথা আছে, চণ্ডীমঙ্গলে কনিষ্ঠা বধূ খুল্লনার অসাধ্য সাধনের কথা আছে, ধর্মমঙ্গলে কর্ণসেনের কনিষ্ঠ পুত্র লাউসেনের অসাধ্য সাধনের কথা আছে। তাছাড়া মনসামঙ্গলে মৃতের পুনর্জীবন লাভের কাহিনী, চণ্ডীমঙ্গলে কমলেকামিনীর কথা, ধর্মমঙ্গলে রঞ্জাবতীর পুনর্জীবন লাভের কথা, লাউসেনের দ্বারা সূর্যের পশ্চিমোদয়ের কাহিনী, লাউসেনের লৌহগণ্ডার ছেদনের কাহিনী রূপকথার কাহিনী । তাছাড়াও মনসামঙ্গলে সঙ্কর গাড়রী ও চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান লাভের কাহিনী, চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান হরণের বৃত্তান্ত, সঙ্কর গাড়রীর মৃত্যু রহস্য, মৃতব্যক্তির আত্মার ভ্রমর-ভ্রমরী রূপ ধারণের কাহিনী, দেবদেবীদের জড়তীবেশ ধারণের কাহিনী রূপকথার কাহিনী। আবার বিভিন্ন উপকথায় পশুপাখির আচার-আচরণ মানুষের আচার-আচরণের মত হয়, তারা মানুষের মত কথাও বলতে পারে, যেমন মনসামঙ্গলে শ্বেতকাক কিংবা শ্বেতমাছির কাহিনী, ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাটুয়া কুকুর, কামদল বাঘ বা

আণ্ডীরপাথর অশ্বের প্রসঙ্গ কিংবা চণ্ডীমঙ্গলে শুক-শারীর প্রসঙ্গ রূপকথা ও উপকথার কাহিনী। তাছাড়া একটি জাতির মানসিক গঠন, তার আদর্শবোধ লোকসাহিত্যে দেখা যায়। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী সতী নারীর অভিশাপে ভিন্‌দেশী অসৎ বণিকের বাণিজ্যতরী চড়ায় আটকে যায়। বেহুলাও দেবলোকে যাত্রাকালে ধনা-মনা, গোদা, টেটন, জুয়ারির পাপাচারকে ব্যর্থ করে সিদ্ধির পথে এগিয়ে যায়, লোহার কলাই সেদ্ধ করে অসাধ্য সাধন করে। সতী নারীকে অগ্নিতে দগ্ধ করতে পারে না, সাপে কামড়ায় না, কাটারিতে কাটে না, এমন কি ছিদ্রযুক্ত কলসীতে জল আনা সম্ভব হয়, তাই ঐ সমস্ত প্রসঙ্গগুলি বেহুলা কিংবা খুল্লনার সতীত্বের বিভিন্ন পরীক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। ধর্মমঙ্গলে নটী সুরিক্ষার অসাধ্য সাধনের কাহিনী বর্ণিত। লাউসেন প্রদত্ত শর্তানুযায়ী—

"মিনি চাষের ধান্যার আতব চালি নিবে।
ভেরান্ডার ঢেঁকিতে সে ধান্য ভানিবে ॥
....
আঙ হাঁড়ি সরা আন সুরীক্ষা সুন্দরী।
চালনি করিয়া আন তারাদীঘির বারি ॥
রন্ধনের কাষ্ঠ হব পানির শিয়ালা।
আমার সাক্ষাতে রান্ধ না করিহ হেলা ॥" (রূপরাম/১৭৩)

ঘনরামের কাব্যেও লাউসেন সুরিক্ষাকে অনুরূপ শর্ত দেয়—

"রন্ধনে ইন্ধন চাই জলের শেয়ালা ॥
সুখান বালির চুলা নূতন নির্ম্মাণ।
উদূখল এড়ণ্ডে ভাজিবে উড়ি ধান ॥
কাঁচা কুম্ভ কেবল কুমার চাকে লবে।
তারা দীঘি গমনে দাড়ুকা পায়ে দেবে ॥
সাতখানি পরে কানি ঝাঁট আন জল।
পার কি না পার মোর বসে নাই ফল ॥
রন্ধন করিতে লবে নব আমা হাঁড়ি।
রাত্রি মধ্যে রান্ধিলে অতিথি তোর বাড়ী ॥" (ঘনরাম/২৯৪)

সুরিক্ষা দেবীর কৃপায় এ সমস্ত অসাধ্য সাধন করেছিল। ব্রতকথার মধ্যেও কোন কোন ক্ষেত্রে এসমস্ত প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান মঙ্গলকাব্যের প্রেরণামূলকে সমৃদ্ধ করেছে।

মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব মূলে বাংলার লৌকিকধর্ম বা লোকধর্মের প্রভাবও বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। একথা সুবিদিত মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ লৌকিক দেবদেবী, লোকসমাজের অভ্যন্তর থেকেই তাদের উদ্ভব। যেমন লৌকিক দেবদেবীর উপর পৌরাণিক আভিজাত্য আরোপের চেষ্টা করা হয়েছিল তেমনি লৌকিক সমাজে প্রচলিত লোকধর্মের উপর পৌরাণিকত্ব আরোপ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কারণ লোকদেবতা ও লোকধর্মের সঙ্গে পৌরাণিক দেবতা ও পৌরাণিক ধর্মের পার্থক্য অনেক। বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সময়ে পৌরাণিক ভাবাদর্শ প্রচার করার প্রয়োজনে লৌকিক দেবদেবীকে নতুন করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এভাবে পুরাণের শিব ও লৌকিক কৃষিজীবী সমাজের দেবতা শ্মশানচারী শিবের মধ্যে একটা ভারসাম্য গড়ে তোলা হয় এবং সে সঙ্গে অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীদেরও কোন না কোন ভাবে শিবের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেওয়ার প্রয়াস দেখা যায়। এভাবে বাংলার নাথধর্মে যে যে লোকদেবতার আদর্শ ছিল তাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৌরাণিক ও

মঙ্গলকাব্যের দেবাদর্শের সঙ্গে এক হয়ে যেতে থাকল। ফলে লোকসমাজে এই মিশ্রিত দেবমূর্তিই প্রতিষ্ঠিত হল, এক্ষেত্রে অবশ্য সর্বাগ্রগণ্য শিবঠাকুর। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই তুর্কী আক্রমণের প্রচণ্ড অভিঘাতে শৈব আদর্শ প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি দেখা গেল মঙ্গলকাব্যের আভ্যন্তরীণ ধর্মাদর্শে। কেননা তখন হিন্দুসমাজ আশ্রিত তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রধান দেবাদিদেব মহাদেবের নিষ্ক্রিয় ভাববিলাসী মূর্তি লোকসমাজের আকাঙ্ক্ষা প্রতিপূরণ করতে সমর্থ হল না, তখন নতুন দেবাদর্শের প্রয়োজনেই লৌকিক স্তরে নারী দেবতা তথা শক্তিদেবীর কল্পনা করা হল। সেই সঙ্গে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় সাংসারিক জীবনে পুরুষের সর্বস্তরের ব্যর্থতায় নারীর খানিকটা উত্থান ঘটল; অন্তঃপুরচারিণী নারী গৃহাভ্যন্তরেই প্রচলিত প্রথাকে আঁকড়ে ধরে নতুন দেবদেবীকে অভ্যর্থনা জানায় আর পুরুষ তার রক্ষণশীল আধিপত্যকে বজায় রাখার জন্য অসহায় নারীকে বারবার লাঞ্ছিত করে। মনসামঙ্গলে তাই মনসাপূজা করার ফলে সনকাকে চাঁদ সদাগর লাঞ্ছিত করে, মনসার ঘটবারি ভেঙে পদাঘাত করে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, এমন কি সনকার মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করানো হয়। চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডীকেও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়।আর ধর্মদেব পুরুষ দেবতা হওয়ায় তাকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি, ধর্মদেব অলক্ষে থেকে হনুমানের সাহায্যে ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে; বরঞ্চ ধর্মমঙ্গলে প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ধর্মদেবের সঙ্গে চণ্ডীর বিরোধই চোখে পড়ে। কিন্তু বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বিশেষ ক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত লৌকিক দেবতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়েছিল ফলে সমাজের অভ্যন্তরে নারী দেবতার অনুপ্রবেশ ঘটে । শুধুমাত্র নারী দেবতা পুরুষ শক্তিরই বিষ নজরে পড়েনি, পক্ষান্তরে নারী দেবতা সৃষ্টিতে তথা নারীর শক্তির উত্থানকে নারীও ভাল চোখে দেখেনি। মনসামঙ্গলে চণ্ডী মনসার বিরোধিতা করে এবং চণ্ডীমঙ্গলে লহনা চণ্ডীর বিরোধিতা করে। এরপর ত্রয়োদশ শতাব্দীর কিছু পর থেকেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের আবার পুনরুত্থান ঘটতে থাকলে দেব চরিত্রগুলি আবার পৌরাণিক ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে ফলে এ সময়ে কিছু কিছু পৌরাণিক দেবমঙ্গল রচিত হতে থাকে।এক্ষেত্রে অন্যতম রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন কাব্য।

বাংলার লৌকিক ধর্মেরক্ষেত্রে অন্যতম বৈষ্ণবধর্ম। বৈষ্ণবধর্মের কমনীয়তা ও প্রেমধর্ম মঙ্গলকাব্যের ভাবাদর্শকে স্পর্শ করেছিল তাই লৌকিক দেবদেবীরা আর তাদের দানবীয় উগ্রতা ও মেজাজকে বেশী দিন ধরে রাখতে সমর্থ হয়নি। চৈতন্য-পরবর্তীকালের লৌকিক দেবীরা যেমন কোমল মাতৃমূর্তি সম্পন্ন তেমনি শৈবপন্থী পুরুষও তাদের পৌরুষ ও উগ্রতাকে রক্ষা করতে পারেনি।বস্তুত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে দিয়েই পুরুষ নারীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে ফলে নৃমুণ্ডমালিনী শক্তিদেবী যেমন রামপ্রসাদের শ্যামা জননীতে পরিণত হয়, তেমনি অন্যক্ষেত্রে মঙ্গলকাব্যেও প্রধান দেবতা হিসাবে পুরুষ দেবতার অনুপ্রবেশ ঘটে। এভাবেই চৈতন্য-পরবর্তীকালে, বিশেষত ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলি সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে।মঙ্গলকাব্যের বাইরের সমাজের অভ্যন্তরে ন্যাড়া-নেড়ী সম্প্রদায়ের মত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠী তৈরী হয়। আবার দেখা যায় লোকধর্মের প্রয়োগ হলেও বৈষ্ণবধর্ম আর মঙ্গলকাব্যের শাক্তধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে। কেননা বৈষ্ণবধর্মের মূল সুর যেখানে ইহজীবন বিমুখতা পারত্রিক কল্যাণ লাভের আকাঙ্ক্ষায় ভরপুর, মঙ্গলকাব্যগুলি সেখানে অনেক বস্তুবাদী ধারা। মঙ্গলকাব্যের মানুষ দেবীর কাছে ধন-জন-ঐশ্বর্য কামনা করেছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন-—"মধ্যযুগের বাংলার সমাজে বৈষ্ণব ধর্ম যেমন বৈরাগ্যের বাণী শুনাইয়াছে, তেমনি অপর পক্ষে মঙ্গলকাব্যবর্ণিত লৌকিক শাক্তধর্ম পরম সংসারাসক্তির গুণগান করিয়াছে। ভোগের ভিতর দিয়া সাধনাই ছিল মঙ্গলকাব্যের আধ্যাত্মিক বাণী।"[৬৩]

এভাবে লৌকিক জীবনের নানা উপাদানের সমন্বয়ে মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী সাহিত্যধারা মঙ্গলকাব্য গড়ে উঠেছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙালীর জন-ইতিহাসের যে খুঁটিনাটি বিবরণ ধরা পড়েছে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তারই তথ্য চয়নের মধ্যে দিয়ে সমাজ বিবর্তনের ইঙ্গিত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্য উদ্ভবের পশ্চাদ্‌ভূমি বিশ্লেষণ বস্তুতপক্ষে বাঙালী সমাজের ভিত্তিভূমি অনুসন্ধানের প্রয়াস।

তথ্যপঞ্জী

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৬৫।

২। ঐ, পৃঃ ২৫২।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৭৯

৪। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃঃ ৪৯।

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড,অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৭৬।

৬। ঐ, পৃঃ ২৭৩।

৭। মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ, অরবিন্দ পোদ্দার, পৃঃ ৫৪-৫৫।

৮। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, গোপাল হালদার, গোপাল হালদার রচনা সমগ্র, পৃঃ ৪৩।

৯। মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ, অরবিন্দ পোদ্দার, পৃঃ ৬৭।

১০। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৪।

১১। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃঃ ৫৩।

১২। ঐ, পৃঃ ৫৪।

১৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬২-৬৩।

১৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড,অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৩৬।

১৫। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃঃ ৬৩।

১৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড,ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১১৪।

১৭। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, পৃঃ ১৪৫।

১৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১১২।

১৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৯২।

২০। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬১।

২১। ঐ, পৃঃ ১১।

২২। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, অতুল সুর, পৃঃ ২২১।

২৩। বাতায়নিকের পত্র, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পঃ বঃ সংস্করণ, পৃঃ ৬৩০।

২৪। বাংলার ব্রতপার্বণ, ডঃ শীলা বসাক, পৃঃ ২।

২৫। বাংলার ব্রত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৫।

২৬। সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সংশোধিত, পৃঃ ৫৩৩।

২৭। বাঙালীর ইতিহাস, (আদিপর্ব) নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ২৯৮-২৯৯।

২৮। বাংলার ব্রতপার্বণ, ডঃ শীলা বসাক, পৃঃ ২২।

২৯। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ৩৯১।

৩০। সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সংশোধিত, পৃঃ ৫৩৩।

৩১। বাংলার লোকসাহিত্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫০৩।

৩২। ঐ, পৃঃ ৫০৪।
৩৩। বাংলার ব্রত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১১।
৩৪। বাঙালীর ইতিহাস, (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ২৯৮।
৩৫। ঐ, পৃঃ ৩২।
৩৬। বাংলার ব্রত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৭।
৩৭। ঐ, পৃঃ ১২।
৩৮। বাংলার ব্রতপার্বণ, ডঃ শীলা বসাক, পৃঃ ২৪।
৩৯। চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, পৃঃ ২৪৬।
৪০। বাংলার লোকসাহিত্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫০৪।
৪১। বাংলার ব্রত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১২।
৪২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১১০।
৪৩। কাশীরাম দাস বিরচিত মহাভারত, দ্বিতীয় খণ্ড, শান্তিপর্ব, পৃঃ ২৩।
৪৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬১।
৪৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১১৩।
৪৬। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ভূমিকা অংশ, পৃঃ ৫।
৪৭। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ৩৯১।
৪৮। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১১৭-১১৮।
৪৯। ঐ, পৃঃ ১১৪।
৫০। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬১।
৫১। ঐ, পৃঃ ৬২।
৫২। পূর্ববঙ্গগীতিকা,'বগুলার বারমাসী', চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পৃঃ ২২৪।
৫৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪০২।
৫৪। A Descriptive catalogue of Bengali Manuscripts volume-1, By Sunilkumar Ojha , Page: 67.
৫৫। চণ্ডিকার ব্রতকথা, দ্বিজ মাধবচন্দ্র, মৃণালকান্তি দাম ও নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত, পৃঃ ৩২।
৫৬। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, ভূমিকা অংশ, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৪০।
৫৭। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬৭৬।
৫৮। ঐ, পৃঃ ৬৭৭।
৫৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১১২।
৬০। ঐ, পৃঃ ১১২-১১৩।
৬১। A Descriptive catalogue of Bengali Manuscripts Volume- 2&3, By Sunilkumar Ojha , Page: 317।
৬২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১২৯-১৩০।
৬৩। ঐ, পৃঃ ৮০।

ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রাপ্ত পাঠ ঃ-

১) "স্ত্রীলোকের পূজা নিতে দেবী কৈল মতি
- - - - - - - - - - - -
পরম রূপসী কন্যা ইন্দ্রের নৃত্যকী।" (পৃঃ ১০৯)

২) "আমরা ইন্দ্রের সুতা এ পঞ্চ ভগিনী
- - - - - - - - - - - -
বিপদ নাশিবে জদি পূজা কর তুমি।" (পৃঃ ১৪৬)

৩) "অবণী মণ্ডলে জাব তোমার কিঙ্করী হব
করিব পূজার অনুষ্ঠান।" (পৃঃ ১১১)

৪) "দেবীর ব্রতের তরে দেবকন্যা বান্যার ঘরে
রম্ভাবতী সফল মানিল।" (পৃঃ ১১২)

৫) "এমন সপন দেখাইআ মাহেশ্বরী
- - - - - - - - - - - -
ছাগল লুকায়্যা দেবী রহিল অম্বরে।" (পৃঃ ১৪৪)

৬) "দেবমানে অবনিতে রয়্যা চারিমাস
কর গিআ পার্বতীর ব্রতের প্রকাশ।" (পৃঃ ১৭৬)

৭) "এই ব্রত ইতিহাস সুনিলে কলুষ নাশ
কলিকালে হইল প্রচার।" (পৃঃ ৩০৬)

৮) "সূর্য-অর্ঘ্য দিআ সদাগর উঠে কূলে
অষ্ট তণ্ডুল দূর্বা পাইল পাগের আঁচলে।" (পৃঃ ২৫৯)